KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৭/১ ৪৭/২ ৪৭/৩ ৪৭/৪ ৪৭/৫	Year of Publication May 1986 Jun 1986 July 1986 Sep 1986 Oct 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

১৯৮৬ • জুন

'ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ'

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে বামপন্থী চিন্তাধারা আর কর্মকাণ্ডের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। বিতর্ক-জাগানো রচনা।

'বিপন্ন মুসলিম মহিলা'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস. এ. মাসুদ তাঁর প্রবন্ধে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন সম্প্রতি-বিধিবদ্ধ 'মুসলিম নারী অধিকার আইন' কেবল অ-মানবিক নয়, ইসলামের মূলনীতিরও বিরোধী।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা—পাঠান্তর'

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম অগ্রপথিক সন্‌জীদা খাতুনের এই রচনায় কবির ভাবলোকের এক নতুন পরিচয় পাওয়া যাবে।

গ্রন্থসমালোচনা : জয়ন্তকুমার রায়, পবিত্র সরকার, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ফ্রান্‌ৎস্ কাফকা সম্বন্ধে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা।

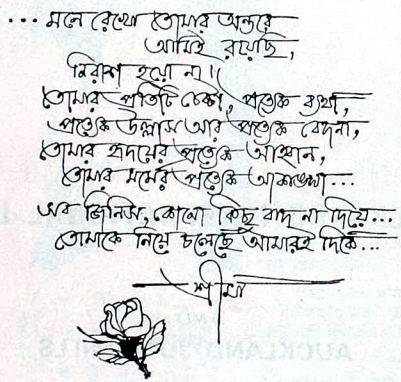

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ২
জুন ১৯৮৬
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ সরোজ মুখোপাধ্যায় ৭১
বিপন্ন মুসলিম মহিলা এস. এ. মাসুদ ১০১
রবীন্দ্রনাথের কবিতা—পাঠান্তর সন্‌জীদা খাতুন ১১৬

সে, সে-ই তো নিখিলকুমার নন্দী ৮৮
ফিরে যেতে চাইলে জয়নাল আবেদীন ৮৯
ঘুমভাঙার পর সুবীর সেনগুপ্ত ৯০
সরাও আঁচল, কলকাতা দিলীপকান্তি লস্কর ৯১

জলচর রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ৯২
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১০৫

গ্রন্থসমালোচনা ১৩২
পবিত্র সরকার, জয়ন্তকুমার রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য : ফ্রান্‌ৎস কাফকা ১৪৫
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা ১৫৭
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হায়াৎ মামুদ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

বাংলা বই-এর খবর—৪

বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর
একটি মিল এইখানে যে
উভয় ভাষাতেই ব্যাকরণ-জ্ঞান
ভাষার নাড়ী বুঝতে সাহায্য করে না।
ইংরেজী ভাষায় প্রয়োগবিধি বিষয়ক বই
অনেক আছে। অথচ
বাংলা ভাষায় প্রয়োগবিধি সম্পর্কিত
কোনো বই এতদিন ছিল না।

সুভাষ ভট্টাচার্যর
আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান
এই অভাব পূর্ণ করেছে।

শব্দের প্রয়োগ,
বানান ও বাক্যরীতি সম্পর্কে এই বইয়ের
আলোচনা অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে।
পৈতৃক? না পৈত্রিক? উহ্য? না উহ্য?
অস্তমান? না অস্তায়মান?
চলমান, আন্তর্জাতিক, নিরাশা প্রভৃতি শব্দ
কি পরিত্যাজ্য?
হাইফেন, কমা ও প্রশ্নচিহ্নের ব্যবহার কেমন
হওয়া উচিত?
বাক্যে অনর্থক শব্দসমাবেশ কেন
ক্ষতিকর?
এইরকম পাঁচশতাধিক বিষয়ের সোদাহরণ
আলোচনা আছে এই বইয়ে।
উদাহরণগুলি আমাদের মুদ্রিত সাহিত্য
থেকে আহৃত।
'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৮৪) প্রাপ্ত এই বইটির
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত
হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে—
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও মননের বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের
কাছে আমাদের বারে বারেই ফিরে ফিরে
আসতে হচ্ছে। শুধু যে প্রতিভার প্রতি
মুগ্ধতার টানে তা নয়, আসতে হচ্ছে নিজেদের
আত্মানুসন্ধান এবং আত্মতা অর্জনের গরজেই।
এমনকি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেও,
যথার্থ আধুনিক হবার তাগিদেও।
সেই কারণে রবীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কার
আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি
এবং
প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও মনন সংক্রান্ত
নানা অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা
এবং নানা আলোচিত বিষয়ের
পুনর্বিচার।
বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক
সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর
সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ
বইটিতে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছেন।
বইটির মূল্য ১৮ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আরো কয়েকটি বই
সুরজিৎ দাশগুপ্তর
দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ—৫·০০
রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের
রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা—২০·০০
জগদীশ ভট্টাচার্যর
কবিমানসী—২৮·৫০

ডি. এম. লাইব্রেরী / ৪২ বিধান সরণী / কলকাতা-৭০০ ০০৬
পোষ্ট বক্স নং ১১৪৫৩ / ফোন ৩৪১০৬৬

ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ

সরোজ মুখোপাধ্যায়

সমাজপ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। অগ্রগতির পথরোধের অপপ্রয়াস হয়। কিন্তু তা কোনোদিন সাফল্যলাভ করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। ইতিহাসের নিয়ম অমোঘ। মানবসমাজের দীর্ঘ ইতিহাস এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। দানবীয় ফ্যাসিজম একদিন যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। তিরিশের দশক আর চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধের বিশ্ব-রাজনৈতিক ইতিহাস তারই প্রমাণ। বিশ্বে মানবসমাজের ইতিহাসে মাঝে-মাঝে অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চলে। তা ব্যর্থ করে দেয় মানবসমাজের অন্তর্নিহিত গতিশক্তি। বর্তমান যুগে মানবধ্বংসী নক্ষত্রযুদ্ধের প্রস্তুতির দ্বারা সেই ধরনের অপপ্রয়াস পুনরায় শুরু হয়েছে। ইতিহাসের গতিশীলতা তাকে ধ্বংস করে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দেবে—এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না সমাজ-বিজ্ঞানীদের আর ইতিহাসবেত্তাদের মনে।

এক

এই পটভূমিতেই রচিত হচ্ছে ইতিহাস। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চলেছে দ্বন্দ্বসংঘাত। সংঘাতের মধ্য দিয়েই নব-নব শক্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। নবশক্তিই সমাজকে অগ্রসর করিয়ে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ঊন-বিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-শিল্প-কৃষি, বিজ্ঞান—সবকিছুতেই একটা সংগঠিত চিন্তা আর কর্ম-সাধনার যুগ ছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার সূচনা আর অগ্রগতি সুস্পষ্ট ছিল। এক-এক বিষয়ে, মানবসমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত-শত দিকপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমাজের প্রতি তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। এই-সমস্ত মনীষী সমাজকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর স্তরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথাই ধরা যাক। রাজনীতিতে সারা দুনিয়ায় যাঁরা পথ দেখিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন শেষ পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন রুজভেলট, চারচিল, স্তালিন প্রমুখ। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান্ধীজী, এম এ জিন্নাহ্, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু। প্রথম দিকের তালিকা আলোচনা করলে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সান ইয়াৎ-সেন, হো চি মিন, আর্নস্ট্ থ্যালমান, মরিস তোরে প্রমুখের নাম করতেই হয়। অপরদিকে বেনিতো মুসোলিনি, অ্যাডলফ হিটলার, তোজো, ফ্র্যাংকো প্রমুখের ব্যক্তিত্বও

অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যে ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক, লালা লাজপত রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মুজফ্‌ফর আহমদ, আব্দুল হালিম, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এ. কে. ফজলুল হক, মৌলানা আক্রম খাঁ, শহিদ সারওয়ার্দি, মহম্মদ লিয়াকত আলি খান, আব্দুল গফুর খান প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন অসীমব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সমাজকে পরিচালিত করার পক্ষে অসম্ভব ক্ষমতাধর এই-সমস্ত রাজনীতিবিদ অকাতরে মানুষকে ভালোবেসেছেন, সমাজসংস্কার, সমাজ-উন্নয়ন এবং সমাজবিপ্লবের পথে মানুষকে তাঁরা উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞানজগতে অ্যালবার্টআইনস্টাইন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সি. ভি. রমণ, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের নাম উল্লেখনীয়। এর পূর্ববর্তী যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পযুগের প্রথম দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মানবসমাজকে বর্তমান যুগের কল্পনাতীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নত শিখরে পৌঁছে দেবার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। গ্যালিলিও, ডারউইন, ফ্যারাডে প্রমুখের নাম অবিস্মরণীয়। এই-সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে মানবসমাজ গর্বের সঙ্গে বলতেপারে—মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কী অসীম শক্তির জন্ম হতে পারে।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও এই ধরনের বেশ কিছু বিরাট পুরুষ জন্মেছিলেন যাঁরা সমাজকে সুন্দর, সুমহান করে তুলেছেন। মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে মৃদু স্পর্শ দিয়ে, কখনো-বা আঘাত করে, কখনো সমাজপরিবর্তনের দিকে, কখনো বা উন্নত চিন্তার দিকে নিয়ে গেছেন এঁরা। ভালোবাসা-প্রেম-মায়া-মমতার গুণাবলী অর্জনে তাঁরা মানুষকে সাহায্য করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টি মানুষকে আকৃষ্ট করে সৌন্দর্যে মহিমান্বিত জীবনযাপনে সাহায্য করেছে। তলস্তয়, তুরগেনেভ, গোরকি, শলোকভ, ইলিয়া এরেনবুরগ, বারনার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্, কডওয়েল, সিডনি-বিয়াট্রিস ওয়েব, র‍্যালফ ফক্‌স্, রমাঁ রল্যাঁ, আঁরি বারবুজ, জাঁ পল সার্ত্র, বোয়ার, ন্যুট হ্যামসুন, ব্রেখট, লু সুন, হেমিংওয়ে, জ্যাক লনডন, আপটন সিনক্লেয়ার প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক-সাহিত্যিক; পিকাসো, মাতিস, সেজান প্রমুখ শিল্পী; চারলি চ্যাপলিন প্রমুখ ছায়াছবি-শিল্পী খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেল, কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স্, নিৎসে প্রমুখ রাজনীতিক দার্শনিক, দাঁতে রবসপিয়ের, রবার্টওয়েন প্রমুখ ইউরোপীয় সমাজবিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি ভারতের অনেক মনীষীর দানও অনস্বীকার্য। উল্লেখযোগ্য নাম পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন। আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, নন্দলাল বসু প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংগীতকার মানবসমাজকে খ্যাতির স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্র- ও শরৎ-সাহিত্যের প্রতিমণ্ডল ছিন্ন করে কল্লোলগোষ্ঠী পরবর্তী যুগে বাঙলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা আমদানি করার প্রয়াস পান। তাঁরা কতদূর সফল হয়েছিলেন তা এখনও সমীক্ষার অপেক্ষায়। তারও পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বাঙালির কাব্য, সাহিত্য এবং সাংবাদিক জগতে অবিস্মরণীয় নাম। অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যদিও তিনি পরে নিজেই নিজের সৃষ্টিকে অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছেন, কবিতা লিখেছেন। জগদীশ গুপ্ত, ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, হিরণকুমার সান্যাল, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, আব্দুল কাদির, জসিমুদ্দিন, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নীরেন্দ্রনাথ রায়,

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যেমন একদিকে একসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম, অন্যদিকে তেমনি সজনীকান্ত দাস, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য। সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। লোক-সংগীত-যাত্রাগানে মুকুন্দদাস, শেখ গোমানি, নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখের দান নানা দিক থেকে। পঙ্কজ মল্লিক, কে. এল. সাইগল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা দেবী, কাননবালা, উদয়শংকর, শিশির ভাদুড়ী প্রমুখ অসংখ্য শিল্পীর দান ভুলবার নয়। পরবর্তী কালে শিল্পজগতে, সাহিত্য- ও কাব্য-জগতে আরও অনেকে এসেছেন। এই প্রসঙ্গেই আর-একটি কথা চলতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রমুখের দানের কথা বলা প্রয়োজন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-কবির দান বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণভারতের বেলায়ুধন, ত্যাগরাজ, আন্না সাঠে, উত্তরভারতের প্রেমচন্দ, সজ্জাদ জহীর প্রমুখ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, মানবসমাজকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু। তাছাড়া মনে পড়ে বহু মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের নাম, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে যাবার আগে এই বাঙলারই সম্পদ ছিলেন। মুসলিম সাহিত্য পরিষদ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা তথা বঙ্গবাসীর কাছে যে দান রেখে গেছেন তা এখনও দেদীপ্যমান। কারণ সে যুগের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সাহিত্যিক কবিগোষ্ঠীর সুমহান সৃষ্টির ঐতিহ্য নিয়েই বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রে, উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের বান বয়ে যায়।

দুই

এ যুগের নতুন কথাটি হল, সারা বিশ্বে যেমন তেমন ভারতে আর পশ্চিমবাঙলাতেও সমস্ত ক্ষেত্রেই অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীর বাস্তব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য, কবিতা-সংগীত-শিল্প—সব ক্ষেত্রেই জ্ঞান চেতনা ব্যাপ্তিলাভ করেছে অনেকের মধ্যে। কয়েকজন বিশেষ মনীষী অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হয়ে বিরাট সু-উচ্চ ব্যক্তিত্বের আসনে আর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন না। পূর্বে কয়েকজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীর নামোল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক নাম উল্লেখ করা হয় নি। এই প্রবন্ধ একটা রিসার্চ পেপার (অনুশীলনপত্র) নয় বলে নিখুঁতভাবে সমস্ত নাম দিতে পারা যায় নি। স্মৃতি থেকে নামোল্লেখ করতে গেলে যে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক তাই থেকে গেছে, এবং সেই গাফিলতির জন্য লেখক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এখন জ্ঞানের ব্যাপ্তির কারণে সাধারণ এবং গড় বুদ্ধি আর ধীশক্তি অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সমগ্র সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞানপ্রতিভার বিকাশক্রমাগত প্রসারলাভ করছে, উন্নত স্তরে উন্নীত হচ্ছে। আজ আর শিক্ষাবিস্তারের আঙিনায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণীকে দেখা যাবে না। অনেকের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত হয়ে পড়ছে। গড় বুদ্ধি স্বাভাবিক গতিতে সমাজের ব্যাপক অংশে প্রসারিত হচ্ছে। সারা সমাজ ব্যক্তিপরিচালিত না হয়ে সমষ্টিগত জ্ঞানবুদ্ধিতে পরিচালিত হচ্ছে। তাতে, সেখনার মতো বিশেষজ্ঞানসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক থাকবেন না তা নয়, বাস্তবতা হল বিজ্ঞানীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে বহু তরুণ অভাবনীয়ভাবে জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন।

সাহিত্য আর কাব্যের জগতে, সংগীত আর নাট্যকলার জগতে, সিনেমা আর যাত্রার ক্ষেত্রে একাধিক কৃতী শিল্পীর আবির্ভাব। সারা দুনিয়ায় যেমন, ভারতেও তেমন। পশ্চিমবাঙলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। রবীন্দ্রসংগীতের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-

গায়িকার সংখ্যা পূর্বে ছিল দু-তিন জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এই সংখ্যা এক শতেরও বেশি হবে। দ্বার খুলে গেছে—সুযোগ-সুবিধা একটু পেলেই অনেকেই বিশেষ-বিশেষ গুণের অধিকারী হতে পারে।

শুধু বিজ্ঞান, সাহিত্য আর শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার কোথাও আজ এমন একজন বিরাট পুরুষ পাওয়া যাবে না যাঁর পরিচালনায় বা অঙ্গুলিহেলনে কোনো একটি দেশের রাজনীতি রূপ নিচ্ছে, অথবা দেশের অধিকাংশ মানুষ যাঁকে মেনে নিচ্ছেন। এটাই সমাজের অগ্রগতি। শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থাৎ শতকরা একশত মানুষের স্বার্থবাহী রাষ্ট্রব্যবস্থা। তার রূপ হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের পথ না ধরে যাঁরাই আবার ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেতে চান তাঁরাই সমাজ আর রাষ্ট্রের পশ্চাদ্‌গামিতাকে ডেকে আনতে চান। এটা সম্ভব নয়। এই দ্বন্দ্ব দেশে-দেশে চলছে প্রধানতধনতান্ত্রিকসমাজব্যবস্থার দেশগুলিতে—যাকে সহজ কথায় আখ্যা দেওয়া হয় গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। মানবসমাজকে সমষ্টিগত জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিস্বার্থ তথা কায়েমি স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস সমীচীন নয়। সমগ্র সমাজের দিকে তাকিয়ে একথাই বলতে হবে।

ইতিহাসের শিক্ষা সকলেরই নেওয়া কর্তব্য। দুই শত বৎসরের রাষ্ট্রপরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং তার ক্রমপরিবর্তনের ধারার অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতে হবে। বিশেষত দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে বিগত একশত বৎসরের অভিজ্ঞতা এই দিগ্‌দর্শনেরই অনুকূলে।

ইতিহাস আজ যেখানে মানবসমাজকে পৌঁছে দিয়েছে সেখানকার নির্দেশ হল : কোনো দেশের জনগণের নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার অধিকার অব্যাহত রাখতে হবে। বিভ্রান্তিকর প্রচারে মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করা চলবে না। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। জনমতের রায় নিয়ে শাসনপদ্ধতি রচনা করতে হবে। সাধারণভাবে এই পদ্ধতিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাকে নস্যাৎ করে কোনো-কোনো দেশে আগ্রাসন, আক্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে সেই-সেই দেশের জনগণের রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, জনমতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতিকে পালটে দেবার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এর দ্বারা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। এ চেষ্টা সফল হতে পারে না।

তিন

ইতিহাসের এই নিয়ম আর শিক্ষাকে সম্বল করেই দেশে-দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি পন্থা স্থিরীকৃত হয়। একটি চরম বা বামপন্থা, অপরটি নরম বা দক্ষিণপন্থা। দুই শত বছর পূর্বে, বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনে, পারলামেনটের অধিবেশনের সময় অধ্যক্ষ বসতেন মাঝখানে উচ্চাসনে ; তাঁর দক্ষিণে বসতেন শাসনক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা, আর তাঁর বাঁদিকে বসতেন বিরোধী দলের সদস্যরা। সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল দেশে এখন এটাই প্রথা। বাম দিকে যাঁরা বসেন, অর্থাৎ যাঁরা বিরোধী পক্ষ, সাধারণত তাঁরা সরকার পক্ষের সমালোচক, শাসনপ্রণালীকে প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চান তাঁরা। ব্রিটেন আর ইউরোপের ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশে অধ্যক্ষের বাম দিকে বসতেন সোস্যালিস্ট সদস্যরা, অথবা লেবার পার্টির সদস্যরা, কখনো বা ব্রিটেনের কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যরাও। লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে কনজারভেটিভ বা লিবারেল পার্টিও বাম দিকে বসেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা বামপন্থী হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রথম দিকে চরমপন্থী বা প্রগতিপন্থীরা সংখ্যায় কম ছিলেন বলে তাঁদের সদস্যরা বাম দিকে বসতেন, তাই তখন থেকেই বামপন্থী নামটি তাঁদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এখনও সেই অর্থেই প্রগতিশীল বা বিপ্লবী বা জনস্বার্থে বেশিদূর যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমন দল আর দলের সদস্যদের বামপন্থী বলা হয়। আমাদের দেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নরমপন্থী আর চরমপন্থী হিসাবে রাজনীতিবিদ্‌রা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। পরে সেই বিভাগ দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী হিসাবে আখ্যাত হতে থাকে। আবার এটাও সত্য যে, কোনো-কোনো সময় কোনো-কোনো দল বা ব্যক্তি বৈপ্লবিক বুলির আড়ালে নিজেদের প্রকৃত চরিত্র লুক্কায়িত রেখে সুবিধাবাদকে আড়াল করার জন্য নিজেদের বামপন্থী বলে থাকেন। যাই হোক, মোটামুটি বামপন্থা আর দক্ষিণপন্থার একটা সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যা রয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে পারলামেনটারি পদ্ধতির ঐতিহ্যটাই এই নামের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

ব্রিটেনে আর ইউরোপে সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, ইউরোপের সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রভৃতি দলগুলিই বামপন্থী নামে পরিচিত। এঁরাই আবার 'লেফট বুক ক্লাব' নাম দিয়ে বামপন্থী পুস্তক, সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট পুস্তক প্রচার করে থাকেন। পরে সোস্যালিস্ট বুক কোমপানিও গঠিত হয়। এইসব বইয়ের সাহায্যে ইউরোপে আর ব্রিটেনে বামপন্থীরা তাঁদের প্রচার-অভিযান পরিচালনা করে থাকেন। আমেরিকায় আবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা। ডেমোক্রেটিক আর রিপাবলিক্যান—উভয়েই একই পন্থা অনুসরণ করে। 'ডেমোক্রেটিক' নাম হলেও দুই দলের মধ্যেই দুই ধরনের সদস্য আছে। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। সাধারণভাবে এসব দেশে বামপন্থা অনুসরণ করে থাকেন কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট দলের সদস্যরা। আমাদের দেশে বামপন্থার উদ্ভব স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা থেকেই।

চার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ দখল করার পর থেকেই, অর্থাৎ ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের মুক্তি, জনগণের শোষণের হাত থেকে মুক্তির কথা ভাবা হত। এর পাশাপাশি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রচারও গোপনে-গোপনে চলতে থাকে। আয়ারল্যানড, ইতালি প্রভৃতি দেশের সন্ত্রাসবাদী তথা বিপ্লববাদী আন্দোলনের ধারায় ভারতের যুবকদের দীক্ষিত করার কাজ শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধি লাটসাহেবকে বোমা মারার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বামচিন্তার প্রকাশ। ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে তারই প্রকাশ। অন্যদিকে, জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থার প্রচার চলে কোনো-কোনো নেতার বক্তব্যের মধ্যে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থা বা বামপন্থার চিন্তাধারা উপস্থিত করেন তিনজন নেতা—বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল আর লালা লাজপত রায়। এই তিনজন প্রভাবশালী নেতা জাতীয় কংগ্রেসে নতুন কর্মপদ্ধতি চালু করতে চান। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনকেও ব্রিটিশ শাসনগোষ্ঠী স্বীকার করতে চায় নি।

বহুখ্যাত সাইমন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় : যাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হয়, তা ভারতবর্ষের কোটি-কোটি অধিবাসীর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মাত্র।

এই মন্তব্যের সমালোচনা করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত লিখেছিলেন, ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা আর প্রচণ্ডতা, এবং ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিয়েছিল সাইমন কমিশনের উপরি-উক্ত বক্তব্য সঠিক না বেঠিক। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চাওয়া হয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভের যোগ্য নয়। ভারতীয় সমস্যার জটিলতা আর প্রচণ্ডতা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—"আয়তন আর জনসংখ্যার বিশালতা", "অন্যূন দুই শত বাইশটি ভাষার জটিলতা", "অসংখ্য বর্ণের ভেদ-বৈষম্যের দুরূহ সমস্যা", "ধর্মমত এবং পথের অন্তহীন বৈচিত্র্য", "হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌলিক বিরোধ", "নানা জাতি, নানা মত, নানা পথের বিচিত্র জটিল সমাবেশ" ইত্যাদি।

সাইমন কমিশনের রিপোর্টের একটি আলোচনা সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল বিলেতের একটি বামপন্থী পত্রিকায়। ব্রিটিশ সমালোচক ডব্লু নেভিনসন লিখেছিলেন: যে বিশাল দেশে আছে পাঁচ-শ আটটি দেশীয় রাজ্য (নামমাত্র স্বাধীন), দু-শ বাইশটি ভাষাভাষী জাতি, পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন দুটি প্রধান ধর্মমতের অসংখ্য লোক (একমাত্র ব্রিটিশ ভারতেই ষোলো কোটি আশি লক্ষ হিন্দু, আর ছয় কোটি মুসলমান), এক কোটি অস্পৃশ্য বা অনুন্নত অধিবাসী, সেই দেশের উপযোগী কোনো সরকার বা শাসনতন্ত্র রচনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বললেই হয়।.....ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁরা ভেবে থাকেন তাঁদের প্রারম্ভেই এই নগ্ন সত্য জানা থাকা চাই। যাঁরা তা জানেন না তাঁদের সাইমন রিপোর্টের প্রথম খণ্ড পড়া উচিত।

রজনী পাম দত্ত এই লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন—একখানি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় নেভিনসনের মতো একজন সহানুভূতিসম্পন্ন বামপন্থী যে ভাষায় অভিমত প্রকাশ করছেন তা থেকেই সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকার্যের সাফল্য বুঝতে পারা যায়। ওই সময় কেবল সরকার-সমর্থক পত্রিকাগুলিই নয়, সেই সঙ্গে প্রায় সমুদয় বামপন্থী পত্রিকা সরকারি প্রচারকে প্রকৃত তথ্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। নিরপেক্ষতার ভান সত্ত্বেও ওই রিপোর্ট আসলে এক নগ্ন প্রচারকার্য। এই রিপোর্টে প্রকৃত খাঁটি তথ্য নেই। বহু প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মগত ভেদ-বিভেদ ভারতবর্ষের প্রধান দুরূহ সমস্যা—পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়ারও যোগ্য নয়—এটাই সাইমন কমিশনের রিপোর্টে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্ট নিয়েই জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বেশ মতভেদ দেখা দেয়।

পাঁচ

অবশ্য ১৯০৫ সাল থেকেই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে চরমপন্থা আর দক্ষিণপন্থার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ১৯০৫ সাল থেকেই নরমপন্থী গোখলের বিরুদ্ধে বাল-পাল-লালেরা নানা অভিযোগ আনতে থাকেন। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে দেশের মুক্তি আসবে না। পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজী গোখলেরই শিষ্য ছিলেন। গণ-আন্দোলনের যে কর্মসূচী চরমপন্থীরা দিলেন তা ছিল অর্থনৈতিক বয়কটের আন্দোলন। এ আন্দোলন নরমপন্থীরাও সমর্থন করলেন। চরমপন্থী যুবকের দল অস্ত্রসংগ্রহ করে ইংরেজ অফিসারদের ব্যক্তিগতভাবে হত্যার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁদের অনেকে অস্ত্র-সংগ্রহের জন্য গোপনে ইউরোপ চলে যান। ১৯০৫ সালে রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্য বালগঙ্গাধর টিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯০৭ সালে 'যুগান্তর'

পত্রিকায় রাজদ্রোহাত্মক রচনা প্রকাশ করার জন্য ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছর কারাদণ্ড হয়। মামলা চলার সময় আদালতে তিনি বলেন: ভারতে ব্রিটিশ শাসন বে-আইনি, যে-কোনো উপায়ে এই সরকারকে উচ্ছেদ করা ভারতবাসীর দিক থেকে সম্পূর্ণ আইনি। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ড. দত্ত আমেরিকা চলে যান, সেখানে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন, এবং পরে তিনি বার্লিন-মস্কো প্রভৃতি স্থানে যান। মানবেন্দ্রনাথ রায়, রাসবিহারী বসু, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিপ্লবী বিদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাহায্যের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন। আমেরিকায় আর কানাডায় গদর পার্টির বহু নেতা এই একই প্রকারে অস্ত্রসংগ্রহ আর দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের কাজ চালাতে থাকেন। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গণ-আন্দোলনের ধারার জন্য সংগ্রাম যেমন জাতীয় নেতারা চালাতে থাকেন, তেমনি বিপ্লবী যুবকের দলও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। এই ভাবেই তখন রাজনীতিতে বামপন্থার প্রকাশ দেখা দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর, রাশিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারতে নতুন চিন্তা দেখা দেয়। শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভাবধারার প্রচার চলতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণ-আন্দোলনের শক্তিতে স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা জাগ্রত হতে থাকে।

নরমপন্থীদের বিষয় বলতে গিয়ে বামপন্থী তথা চরমপন্থীরা কিভাবে যুক্তি দিতেন তা জানা দরকার। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "ভুল পথ অনুসরণ করিতে যাইয়া দেশের প্রকৃত কার্য বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের ভীষণ দারিদ্র্যের কথা ধরো। হোমচারজ যদি সফল হয় তাহা হইলে দারিদ্র্যের কতকটা লাঘব হইবে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু দারিদ্র্যের অল্পমাত্রায় লাঘব করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমোচনই উদ্দেশ্য। সেই দারিদ্র্য-মোচনের দুটি উপায় আছে, কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ করা, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে সংরক্ষিত বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করা। এ অবস্থায় অনন্যচিন্ত হইয়া সেই দুইটি দাবিই সর্বাগ্রে রাজপুরুষদিগের নিকট আদায় করিবার চেষ্টা কংগ্রেসের প্রথম কর্তব্য ছিল। রাজপুরুষগণ কিন্তু কখনও সে দাবি শুনিবেন না। সুতরাং স্বাবলম্বন। দেশময় ব্রিটিশ বাণিজ্যের বয়কট প্রচার করো, ভারতের কোটি-কোটি কৃষিজীবীকে নিজেদের দুরবস্থার কারণ ও মুক্তির উপায় বুঝাইয়া দাও। দেখি রাজপুরুষগণ কতদিন একটি মহৎ জাতীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি বয়কটের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠে, এমনকি স্বদেশী সম্বন্ধেও কোনো প্রস্তাব করিতে চাহে না, পাছে ইংরেজদের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে।"

ড. দত্ত তারপরেও লেখেন, "আমরা দলে-দলে জেলে যাইতে লাগিলাম। ইহাতেও নেতাদের জ্ঞান হইবে না কি? ইহাতেও তাঁহারা বুঝিবেন না কি কোন্ দিকে ভারতের নবজীবনের বালসূর্য গগন-মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হইতেছে?"

তিনি 'সোনার শিকল কাটো' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন: "ইংরেজের নেতৃত্ব বন্ধ করিয়া ইংরেজের অনুকরণ বন্ধ করিয়া আমাদের জাতীয় স্বভাব ও দেশের অবস্থা বুঝিয়া অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। আর নবোত্থিত ভারতবর্ষকে মহৎ আদর্শ দেখাইয়া নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই পথই মুক্তির পথ, অন্যথা বন্ধনই সার।"

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার পূর্ব পর্যন্ত বালগঙ্গাধর টিলক ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯০৭ সালে টিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোমবাই-এর কাপড়ের কলের কর্মীরা সাধারণ ধর্মঘট করেন। শ্রমজীবী জনগণের এই প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ-

প্রদর্শন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত বাঙলা দেশেই ৫৫০টি রাজনৈতিক মামলা আদালতে দায়ের করে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ। পানজাবে কৃষকবিদ্রোহ হয় —সরকার নিষ্ঠুরভাবে তাকে দমন করে। জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য স্কুলের ছোটো ছেলেমেয়েদের গ্রেপ্তার করা হত। নরমপন্থী জাতীয় নেতাদের আবেদন-নিবেদনের ফলে ১৯০৯ সালে মরলে-মিনটো শাসন-সংস্কার দেওয়া হয়। আইনসভা গঠিত হয়, তবে তারা শুধু পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করত। ১৯১০ সালে ভারতে নতুন বড়লাট এলেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের প্রশংসা করেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিপ্লববাদী অংশ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে সংগ্রামশীল অংশের কার্যকলাপ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতার দাবি, পূর্ণ স্বরাজের দাবি এই সময়েই সারা দুনিয়ার সামনে উত্থিত হয়।

ছয়

১৯১৬ সালে লখনউ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের মিলন হয়ে যায়। ১৯১৭ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন, এবং বড়লাটের সঙ্গে দিল্লীতে আলোচনা শুরু করেন। অবশ্য এর পূর্বেই যুদ্ধ বাধবার সময় লনডনে অবস্থিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য আর সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন লাজপত রায়, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, এস. সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চালায় এবং মনটেগু শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করতে চায়। মনটেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে দ্বৈতশাসন দিতে চাওয়া হয়েছিল। ১৯২০ সালেই এই আইন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে স্যার উপাধি পরিত্যাগ করেন। জাতীয় কংগ্রেস এক গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর বামপন্থীরা সে সময় শ্রমিকদের সংগঠিত করে স্বাধীনতার দাবি উচ্চারণ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন দাশ শাসনসংস্কার বর্জনের দাবি তোলেন। শ্রমিকরা বোমবাইয়ে ধর্মঘট শুরু করে দেন। গান্ধীজীও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেন। ব্রিটিশের হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের থিওরি মিথ্যা প্রমাণিত হল। সরকারের তদানীন্তন রিপোর্টে লেখা হয় : এই আন্দোলনের একটি উল্লেখ-যোগ্য লক্ষণ হচ্ছে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃভাব। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে এরূপ মিলন জাতীয় আন্দোলনের বহুকালের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক মিলনের বহু অপূর্ব দৃশ্য সংঘটিত হয়েছে। হিন্দু প্রকাশ্যেই মুসলমানের হাতের জল খেয়েছে এবং মুসলমান হিন্দুর হাত থেকে জলগ্রহণ করছে। শোভা-যাত্রাগুলির শ্লোগানে বা আওয়াজে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। হিন্দু নেতারা সত্য-সত্যই মসজিদের মধ্যে গিয়ে বক্তৃতা পর্যন্ত করেছেন। (ভারত, ১৯১৯)।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতি লালা লাজপত রায় বললেন : আমরা এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি। ধীরে-ধীরে চললে হবে না। সংকল্প গ্রহণ করেছি, সুতরাং ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হতে হবে। আমরা বিপ্লবকে সম্পূর্ণ-ভাবে এড়িয়ে চলতে পারি না।

গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের কর্ণধার। তাঁরা দুজনেই গান্ধীজী আর মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দশ বছর ধরে চলে দক্ষিণপন্থার সঙ্গে বামপন্থার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃত্ব

অর্থাৎ গান্ধীজীর পরিচালনায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কখনো আন্দোলন চালাতে বলেন, আবার পরক্ষণেই আন্দোলন বন্ধ করেন। কখনো কৃষকবিদ্রোহ, সৈন্যবিদ্রোহ প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন। এইভাবে গণ-বিক্ষোভের চাকা টেনে ধরাই ছিল তাঁদের নীতি। তা ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়েই চলে দ্বন্দ্ব। জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীরা মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠন এবং আন্দোলনের ওপর জোর দেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা পাশ করতে বলেন। কিন্তু তা হয় না। আর একাংশ— পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখেরা কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে স্বাধীনতার দাবি করেন এবং আপস-আন্দোলনের পরিবর্তে সংগ্রামের আহ্বান দিতে চান। তা ছাড়া তরুণ যুবকদের দল সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালান। ইংরেজদের হত্যা করে তাঁদের মধ্যে ভীতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সশস্ত্র বিপ্লবের জমি তৈরির কথা তাঁরা বলেন। হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি ভগৎ সিংহের নেতৃত্বে, সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সংগঠন, যুগান্তর, অনুশীলন, এবং অন্যান্য দল এই পথের জন্য প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। বাঙলার উল্লেখ-যোগ্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলগুলি হল : যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলানটিয়ারস, উত্তরবঙ্গ গ্রুপ, চট্টগ্রাম গ্রুপ, মেদিনীপুরের কংগ্রেস—এইসব দলের সদস্যরা বাঙলার সমস্ত কারাগারে এবং আন্দামানে বন্দী ছিলেন ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত, এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দী ছিলেন ৪৩ জন। শেষ পর্যন্ত যে ৪৩ জন জেলে ছিলেন তাঁরা সকলে মিলে ৬০০ বছর জেল খেটেছেন। বিশের দশকের শেষ পর্যন্ত এই তিন ধরনের বামপন্থী শক্তি —অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের অংশ হিসেবেই শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলনকারী কমিউনিস্টরা, কংগ্রেস নেতৃত্বের সংগ্রামী অংশ, এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তরুণের দল। এঁরা সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা চান, শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থবাহী কর্মসূচী রূপায়ণ করতে চান, এবং একটা বৃহৎ অংশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। দুটি ঘটনা স্মরণীয়। ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, আর ওই ১৯২৯ সালেই শ্রমিকনেতা ও কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে মীরাটে কমিউনিস্ট মামলা শুরু হয়।

সাত

তিরিশের দশকে আবার আপস না সংস্কার—এই প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। আন্দোলন থামাও, ব্রিটিশের সঙ্গে আপস-আলোচনা চালাও—এই এক লাইন। আর-এক লাইন—না, আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাও। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতামতের এই দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, জওহরলাল নেহরু দেশ-বিদেশে, বিশেষত সোভিয়েত আর চীনে সফরের পর থেকেই সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিলেতে থাকার সময় ভারতের স্বাধীনতা লীগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ভি. কে. কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তিনিও এই লীগের প্রচারকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের বাণী তিনি প্রচার করেন। তাঁরই প্রেরণা পেয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহের আলি, অচ্যুত পটবর্ধন। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন এম. আর. মাসানি, ড. রামমনোহর লোহিয়া, আচার্য নরেন্দ্র দেব, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ বহু বামপন্থী কংগ্রেস নেতা। ১৯৩৪ সালে গঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ প্রমুখ কেরালার কংগ্রেস নেতারা যোগ দেন। অন্ধ্রের

পি. সুন্দরাইয়া প্রমুখ এবং বাঙলার বহু কমিউনিস্ট এই পার্টিতে যোগ দেন, এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। কিন্তু মাসানির উদ্যোগে কমিউনিস্টদের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে বের করে দেওয়ায় এক ব্যাপক অভিযান চলে ১৯৩৮ সালেই। কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ছিল এর একমাত্র কারণ। তখনও জয়প্রকাশ নারায়ণ এই মতের সমর্থক ছিলেন না। জওহরলাল নেহরু সকলকেই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করতে বলতেন। আলাদা পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করায় তাঁর আপত্তি ছিল না।

তিরিশের দশকের শেষ দিকে ১৯৩৮ সালে সমস্ত বামপন্থীদের নিয়ে 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' গঠনের প্রয়াস চলে। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে রাখা—আপসের পথে যেতে না দেওয়া। বামপন্থীদের উদ্যোগে জওহরলাল নেহরুর পরে সুভাষচন্দ্র বসুকে দু-দুবার কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বার দক্ষিণপন্থীদের চাপে পড়ে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। এর পূর্বেই সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। তথাপি এইসব বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে লড়তে থাকে। এই শক্তির প্রতি সব সময় সমর্থন ছিল কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আর সরোজিনী নাইডুর।

আট

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বামপন্থীদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি দেখা দেয়। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ১৯৪০ সালের পর থেকে কোনোরূপ সংহতি সাধনের কাজ করতে পারে না। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর 'না এক পাই, না এক ভাই' আওয়াজে সকলে সাড়া দেয় নি। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এই কাজে নিযুক্ত হন এবং দলে-দলে বহিষ্কৃত অথবা ধৃত হন। অনেকে আত্মগোপন করেন। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসিদের আক্রমণের পর থেকে অর্থাৎ যুদ্ধের মোড় ফিরে যাবার পর থেকে (১৯৪২ সালের ২২শে জুন থেকে) সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে যায়। এই সময় অগসট মাসে গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু সমেত কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির সকল সদস্যকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে এবং ভারতের রাজনীতিতে একটা গুরুতর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। কোনো-কোনো দল ভাবতে থাকেন, ফ্যাসিসটদের সহায়তায় দেশে স্বাধীনতা-লাভের পথ সুগম হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপদ আর পরাজয় যে মানবসমাজের সর্বনাশ করবে, তা তাঁরা একবারও ভাবলেন না। কংগ্রেস নেতারাও জেলে গিয়ে নীরবনিষ্ক্রিয়তার পথে অপেক্ষা করার পথ গ্রহণ করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে জাতীয় মুক্তি এবং সমস্ত দল, বিশেষত কংগ্রেস-লীগের ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে জোর আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তি 'তোড়ফোড় আন্দোলন' চালাতে থাকেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব ঠিকমত রাজনৈতিক কৌশল না নিতে পারার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের উপর ভরসা করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের চক্রান্ত, এমন-কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় অর্থাৎ ফ্যাসিসট নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের পর ভারতে সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে সংগ্রামের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনী আর নৌবাহিনীর

বিদ্রোহ, সরকারি কর্মচারীদের বিশাল ধর্মঘট, সমস্ত প্রদেশে শ্রমিক-কৃষকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সমস্ত দেশীয় রাজ্যে বিরাট আন্দোলন, কৃষকদের তেভাগা সংগ্রাম —সবকিছু মিলে সারা ভারতে একটি অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আই-এন-এ দিবস, ভিয়েতনাম দিবস, রশিদ আলি দিবসে কলকাতার বুকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আর আবদুস সালামের রক্তে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি জোরদার হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। ঠিক এই অবস্থায়ই কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস-আলোচনা শুরু করে দেন। জনগণের বিভিন্ন অংশের সংগ্রাম নেতারা বন্ধ করে দেন। নৌবাহিনীর বিদ্রোহ চলে বোমবাইয়ের সমুদ্রে, সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বন্দরে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর কমিউনিস্ট পতাকা একসঙ্গে বেঁধে নৌবাহিনী বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। সরদার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগ্রাম বন্ধ করতে আহ্বান দেন। সে প্রতিশ্রুতি কোনোদিন পালিত হয় নি। গান্ধীজী নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে থাকেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অন্য মত থাকলেও জওহরলালের নেতৃত্বে মাউনটব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ব্রিটিশের কৌশল সফল হয়। এই কৌশল সফল করার জন্যই তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাট-বিরাট দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। হাজার-হাজার নিরীহ হিন্দু-মুসলমানের প্রাণ যায়। ভারতকে দুই খণ্ড করার জন্য ব্রিটিশের চক্রান্ত সাফল্যলাভ করে। যে বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার পরিণাম ছিল সারা ভারতকে অখণ্ড রেখে ব্রিটিশের হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু কংগ্রেস আর লীগ নেতৃত্বের কৌশলের ভুলের জন্য ব্রিটিশ কৌশলের জয় হয়। এই অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারতের দ্বিখণ্ডিত হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে হত।

এই পাঁচ বছরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির শেষে ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং লিয়াকত আলি খাঁর নেতৃত্বে সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। স্বাধীন ভারত, স্বাধীন পাকিস্তান। কংগ্রেস আর লীগ নেতৃত্ব জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে বৃহৎ মূলধনী আর বৃহৎ ভূস্বামীদের স্বার্থবাহী কর্মসূচী সরকারের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করতে থাকেন। ধীরে-ধীরে কংগ্রেস আর লীগ সংগঠন থেকে বামপন্থীরা সবাই দলে-দলে বেরিয়ে আসেন, এবং কংগ্রেস-লীগের বাইরে বিভিন্ন পার্টি গঠন করতে থাকেন।

বামপন্থীরা জনস্বার্থে কাজ করবার উদ্দেশ্যে আবার একত্রিত হতে থাকেন।

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেশের স্বাধীনতা যখন দ্বিখণ্ডিত রূপে ব্রিটিশের দলিলে লিখিত হচ্ছে, তখন পানজাব আর বাঙলাকেও দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনাও করা হয়। গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনা চলছে, জওহর-লিয়াকত-মাউনটব্যাটেন আলোচনা চলছে—স্বাধীন ভারত আর স্বাধীন পাকিস্তানের রূপরেখা রচিত হচ্ছে। ঠিক এই সময়েই বাঙলায় শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী কংগ্রেসিরা, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা এবং বাঙলার কমিউনিস্টরা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন—আমরা বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ বাঙলা আমরা চাই। এই অখণ্ড বাঙলা, স্বাধীন বাঙলা ভারতের ভিতরে অথবা স্বতন্ত্রভাবেও থাকতে পারে। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের সামনের সারিতে ছিলেন—নওশের আলি, আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরি, মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা)। এঁদের সমর্থন করেছিলেন শহিদ সুহরাবর্দি, ফজলুল হক,

মৌলভী আকরম খাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ। এই যুক্ত আবেদনপত্র হাজার হাজার বিলি করা হয়। কিন্তু জাতীয় স্তরে কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃত্ব এত দৃঢ়তার সঙ্গে মাউনটব্যাটেন পরিকল্পনার অনুকূলে মত দেন যে এই প্রয়াস কোনোমতেই সফল হবার সুযোগই ছিল না। তবে বাঙলার কোন্-কোন্ জেলা আর অঞ্চল পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানে যাবে, তার জন্য জনমত (প্লেবিসাইট) গ্রহণ করতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়। কয়েকটি জেলায় এবং অঞ্চলে এই জনমত গ্রহণ চলতে থাকে। অবশেষে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় কংগ্রেস লীগ নেতৃত্ব। এক বছর ধরে সারা বাঙলার মানুষের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য আর অস্থিরতা দেখা দেয়। অবশেষে বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হয়, এবং উভয় বঙ্গেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের শক্তি কাজ করতে থাকে। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ঐতিহ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গৌরবময় ঐতিহ্য ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলতে থাকে।

নয়

পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকেই শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসনের অবিচার, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। পূর্ববঙ্গেও চলতে থাকে গণতন্ত্র আর মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই।

বাঙলার দীর্ঘ বামপন্থী ঐতিহ্য উভয়বঙ্গেই অম্লান রাখার লড়াই চলতে থাকে। বাঙলায় জাতীয় আন্দোলন, শ্রমিক আর কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বামপন্থার উদ্ভব হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর ঐক্যবন্ধনের রক্তরাখীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেউ কোনদিন স্তব্ধ করতে পারে নি।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন চলেছে গণতন্ত্রের লড়াই, কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, ঠিক তেমনি পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) গণতন্ত্রের লড়াই, বাঙলা ভাষার মর্যাদা অর্জনের লড়াইও জোরদার হয়ে ওঠে।

বাঙলা ভাষার জন্য ২১শে যে রক্তঝরাতে শহীদরা রক্ত দিয়ে যে ভবিষ্যৎ রচনা করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। আজ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে বাঙলা ভাষা একটা জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তী যুগের বাংলাদেশে যে গতিতে চলেছে তা অভাবনীয়। বাংলাদেশে আজ বাঙলা ভাষার বিশেষ বিকাশ লক্ষ করা যায়।

তা ছাড়া, যেমন পশ্চিমবাঙলার বামপন্থীরা কখনো ঐক্যবদ্ধভাবে, কখনো পৃথক-পৃথক ভাবে কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে চলেছে, ঠিক তেমনি পূর্বপাকিস্তানে এবং পরে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের লড়াই একদিনের জন্যও স্তব্ধ থাকে নি। উত্তরোত্তর এই সংগ্রাম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার জনগণের মরণজয়ী লড়াই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখনও সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বাংলাদেশে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় গণতন্ত্রের লড়াই এখানে অনেক বেশি ব্যাপক, তীব্র আর জোরালো। এর একমাত্র কারণ যুক্ত বাঙলায় গত চল্লিশ বছর ধরে যে বামপন্থী শক্তি গড়ে উঠেছে, হিন্দু-মুসলমান জনগণের মধ্যে যে বামপন্থী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য উভয় বঙ্গের জনগণই বহন করে চলেছেন, এবং তাকে অম্লান রেখে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বামপন্থার এই শিকড় জনগণের মধ্যে গভীর থেকে আরও গভীরে চলে গেছে। একে পরাস্ত করা সহজ নয়। উভয় বঙ্গের সাধারণ মানুষের রক্ত-মাংসের সঙ্গে গণতন্ত্র আর রাজনীতি মিশে একাকার হয়ে আছে। কায়েমি স্বার্থ বনাম জনস্বার্থের এই সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে

সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে বিকল্প সরকার গঠনের রণধ্বনি শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নির্বাচনে এই রণধ্বনি মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে।

নির্বাচনের এই মূল আওয়াজের পশ্চাদ্‌ভূমিতে আছে জীবনজীবিকার জন্য একটানা গঠনমূলক সংগ্রাম। জনগণের আন্দোলন আর সংগ্রাম, এবং তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসি শাসনের নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আরো সংগ্রামশীল করে তোলে। বিভিন্ন প্রশ্নে দলে-দলে কারাবরণ এবং পুলিশের লাঠি-গুলির সম্মুখীন হওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল—দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে কংগ্রেস বনাম বামপন্থীদের লড়াই চলেছে বিরামহীনভাবে। এই পনেরো বছরে গণসংগ্রামে হাজার-হাজার নরনারী জেলে গেছেন এবং পাঁচশতাধিক নরনারী কংগ্রেসি পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন।

এই সংগ্রাম চলেছে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষকদের দাবিতে, বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং ট্রাম কোম্পানিকে জাতীয়করণের দাবিতে, খাদ্যসরবরাহ, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের দাবিতে, রেশন আর মহার্ঘভাতার দাবিতে। ১৯৫৯ সাল আর ১৯৬৩ সালের খাদ্য-আন্দোলনের ওপর কংগ্রেসের অত্যাচার আর পুলিশি নির্যাতন পশ্চিম-বাঙলায় জনগণকে কংগ্রেসের অপশাসন সম্বন্ধে আরও সচেতন করে তোলে। সাধারণ মানুষ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসকে কায়েমি-স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান রূপে চিহ্নিত করতে ভুল করে নি। এমনকি কংগ্রেসের একাংশ কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে লজ্জা পাচ্ছিলেন, তাঁরা বাইরে এসে বাঙলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস এই সরকারের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভেদাভেদসৃষ্টির চেষ্টা করে। বাঙলা কংগ্রেসের সঙ্গে চক্রান্ত করে এই সরকারের পতন ঘটাবার প্রয়াস চালায়। শুধু কংগ্রেস থেকে বাইরে চলে আসা ব্যক্তি আর দলের মধ্যে নয়, কিছু-কিছু বামপন্থী শক্তিকেও বিভ্রান্ত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিতে সক্ষম হয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। জনগণের চেতনা এত বেশি কংগ্রেসবিরোধী ছিল যে, ১৯৬৯ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের পতনের পর পুনরায় যে নির্বাচন হয় তাতেও কংগ্রেস পরাজিত হয় আরো বেশি সংখ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে এত সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সংখ্যায় কোনোদিন বিধানসভায় দেখা যায় নি। দ্বিতীয় বার আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব এবং বামপন্থী, বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের ওপর বিশ্বাস জনগণের মধ্যে ক্রতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় বারও চক্রান্ত করে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। বামপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্বও এজন্য কম দায়ী ছিল না।

তারপর চলে নির্বাচনে কারচুপি আর সারা রাজ্যে এক ভয়াবহ হত্যালীলা। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এক দারুণ বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলতে থাকে। ৭১ সাল থেকে তিন বছরে ২২০০ নকশাল, কমিউনিস্ট, অন্যান্য বামপন্থী, কংগ্রেসি, পুলিশ নিহত হয়। এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্য একজনও গ্রেপ্তার হয় নি, একটা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয় নি। আধা-ফ্যাসিবাদী এই পদ্ধতিতে কংগ্রেস শাসন পরিচালনার পরিণামে ১৯৭৭ সালে এই কংগ্রেস পুনরায় নির্বাচনে একটি ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়। বিধানসভায় মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে তাদের কয়েক বছর চলতে হয়। কংগ্রেস জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। বামপন্থীরা আবার ধীরে-ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। নিজেদের ভুলভ্রান্তি বুঝতে পেরে সব দলই আবার একটি ফ্রন্টে সমবেত হতে থাকেন। বামপন্থার অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রবল যে বারে-বারে আঘাত করে, আক্রমণ করে, শত চক্রান্তের জাল বিস্তার

করেও এই শক্তিকে পর্যুদস্ত করা যায় নি। এই শক্তিই যে পশ্চিমবাঙলার ভবিষ্যৎ, তা বুঝতে কারুর কষ্ট হয় না।

দশ

রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবাঙলার জনগণ ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলির হাতে রাজ্যের ক্ষমতা অর্পণ করেন। পশ্চিমবাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম একটি সরকার যে প্রথম দিনেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়, এবং সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। এই সরকার ঘোষণা করে—কোনো প্রতিশোধ নয়, কংগ্রেস শাসনে যারা অত্যাচার করেছে তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে, প্রতিশোধগ্রহণ চলবে না। সারা রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্দোলনে আর সংগ্রামে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়। একটা সুস্থ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সরকারের কাজ শুরু হয়। আরো বড়ো কথা আছে। সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন : সমস্ত দলের মানুষ আর তাঁদের সংগঠনের পরামর্শ নিয়েই আমরা সরকার চালাব। জনগণের পরামর্শ নিয়েই আমরা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তাঁদের সমালোচনা আমরা সাদরে গ্রহণ করব এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। এই সরকারের ক্ষমতা সীমিত। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সর্ব বিষয়ে আমাদের বিরোধিতা করবে, তৎসত্ত্বেও এই সরকার নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের সেবা করে চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গত কয়েক বছরে ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি মেহনতি মানুষ—শ্রমিক কর্মচারী কৃষক খেতমজুর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী খুব ভালো করেই দেখেছেন। গণতন্ত্রকে পিষে মারার জন্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য সর্বপ্রকার অপপ্রয়াস সম্পর্কে জনগণ ওয়াকিবহাল হয়েছেন।

গণতন্ত্রসচেতন পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে কিভাবে দমন করা যায়, সে বিষয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার নানা কৌশল অবলম্বন করেছে এবং করছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় এ বিষয়ে আমাদের রাজ্যের জনগণের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত।

কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, যেহেতু এ রাজ্যে জনগণের ভোটে বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই কারণে এ রাজ্যকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করার জন্য কেন্দ্রের অপচেষ্টার অন্ত নেই। আর্থিক প্রশাসনিক ইত্যাদি নানা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওপর সীমাহীন অবিচার চলছে। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা এবং অধিক অর্থসম্পদের দাবিতে সংবিধান সংশোধনের জন্য দীর্ঘ দশ বছর ধরে বামপন্থীরা সংসদের উভয় কক্ষে দাবি করে এসেছেন। ১৯৭২ সালে সংসদে বামপন্থী সদস্যরা এ বিষয়ে একটি সংবিধান-সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। তখন থেকে সমস্ত বামপন্থী শক্তি কেন্দ্র-রাজ্য-সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। দশ বছর ধরে এই আন্দোলনের পাশে এসে সমস্ত অকংগ্রেসি রাজ্য সরকার, এমনকি কোনো-কোনো কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য সরকারও দাঁড়ায়। রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করো, এ প্রচারও আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এ আন্দোলন জোরদার হওয়ার ফলে ইন্দিরা কংগ্রেস সারকারিয়া কমিশন গঠন করেছে। একথা পরিষ্কার বোঝা প্রয়োজন যে, সংবিধান সংশোধন ব্যতীত রাজ্যের হাতে বেশি ক্ষমতা এবং আর্থিক সম্পদ দেওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না। বর্তমানে এর পরিবর্তে চলেছে আরো বেশি-বেশি করে ক্ষমতা আর সম্পদ কেন্দ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। এমনকি

শিক্ষার মতো বিষয়কে রাজ্যসরকারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা আরো দৃঢ়তর করা হচ্ছে, এ বিষয়েও কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হচ্ছে। যুগ্মতালিকায় এর স্থান স্থায়ী করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের হাতে বেশি ক্ষমতা তুলে নিয়ে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ফেডারাল চরিত্র মুছে ফেলা হচ্ছে। ফেডারাল কাঠামোয় ইন্দিরা কংগ্রেসের বিশ্বাস নেই। এ রাজ্যের জনগণের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ইন্দিরা কংগ্রেস ভালো চোখে দেখে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি শিল্পের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে, আর্থিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবিচার চলছে তা অবর্ণনীয়। অন্য রাজ্যের উন্নতি আমরা সবাই চাই। ভারতের বিভিন্ন অংশের জনগণের স্বার্থবাহী কর্মকাণ্ডে আমরাই সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করি। কারণ জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্য রক্ষার গর্ববোধ এবং ভারতীয় হিসাবে গর্ববোধ আমাদের রাজ্যের মানুষের চেয়ে বেশি আর কার? অন্য রাজ্যের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করলে, শিল্প-কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করলে আমরা খুবই খুশি হই। কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করলে চলবে কেন? রাজনৈতিক কারণে এই বৈষম্য কেন? শুধু আমাদের রাজ্যের নয়, সারা ভারতের জনগণকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

তৃতীয়ত, বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং অর্থসম্পদের স্বল্প সংগতি নিয়েও জনগণের স্বার্থবাহী অনেক কিছু কাজ করতে সক্ষম। জনগণের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান এই সমাজব্যবস্থায় সম্ভব নয়, তা রাজনীতিসচেতন মানুষমাত্রেই জানেন। কিন্তু আরও অধিক ক্ষমতা আর অর্থ পেলে, কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং রাজ্যের ন্যায়সংগত প্রাপ্যগুলি পেলে, রাজ্যের জনগণের স্বার্থে অনেক বেশি কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব। রাজ্যের শিল্পবিকাশে অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব; কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের আরো অনেক উন্নতি সম্ভব। এই কারণেই বামফ্রন্টের কর্মসূচীতে কেন্দ্রের কাছে আঠারো-দফা দাবি রাখা হয়েছে। এইসব দাবি আন্দোলনের চাপে আদায় করা যায়, আদায় করতে হবে। এই আন্দোলন রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসেই শুধু নয়, দেশের বামপন্থার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। দীর্ঘদিনের বামপন্থা এই শিক্ষাই দেয় যে সারা ভারতে অগ্রগতির পথ হচ্ছে কেন্দ্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সাধন।

বাঙলায় বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকের বামপন্থার আন্দোলনে যে তীব্র গতি সঞ্চারিত হয়েছিল তা-ই এখনও অব্যাহত আছে। এই ইতিহাস সম্পর্কে উপলব্ধি থাকলে পশ্চিমবাঙলায় শুধু নয়, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের বামপন্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। বামপন্থার অন্তর্নিহিত শক্তি দুর্দম গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে এর প্রমাণ মিলছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থার আজ অসাধারণ মূল্য। এর গতিশীলতা, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই পন্থার প্রয়োজনীয়তা আর কার্যকারিতা আজ ক্রমবর্ধমান—তা সকলের উপলব্ধিতে আসছে।

এগারো

দক্ষিণপন্থা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সাহায্য করে। বামপন্থা সমাজপ্রগতিকে অগ্রসর করায়। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চিন্তার গণ্ডি, পশ্চাদ্‌দৃষ্টিমতে সমাজে অবস্থানের নিরিখে বিচার করতে হয়। সর্বজনের স্বার্থে, না কতিপয় ব্যক্তি আর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হতে হবে—সেটাই আসল কথা। দীর্ঘ তিরিশ বছরেও

ব্যাপক জনগণ যখন অভিজ্ঞতায় দেখলেন তাঁদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অসহনীয় কষ্টের কোনো লাঘবই হচ্ছে না, শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ কোনো উন্নতি হচ্ছে না, তখনই তাঁদের প্রয়াস চলে বর্তমান পরিচালকদের পরিবর্তে নতুন পরিচালকদের উপর দায়িত্ব দেবার। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থার এবং জনস্বার্থরক্ষার আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনগণের বিপুল সংখ্যা কংগ্রেসকে পরিহার করে বামপন্থী শক্তিকে রাজ্যশাসনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন ১৯৭৭ সালে। বামপন্থার বিজয়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়ে উঠল!

পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখছেন শান্তি-শৃঙ্খলা, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর গণতন্ত্র বাধাহীনভাবে ভোগ করার অধিকার এই সরকারের আমলে সুরক্ষিত। দুঃখকষ্টের জীবন হলেও শান্তিতে, সোয়াস্তিতে দিন কাটানোর সুযোগ পাওয়া গেছে। পুরাতন দিনগুলির কথা স্মরণ করলে গা শিউরে ওঠে। দিবারাত্র হাঙ্গামা, পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে বোমাবাজি, চাঁদার জোর-জুলুম, মারপিট—শান্তি নেই কোথাও। এই ছিল কংগ্রেস রাজত্বের শেষ দশ বছর। যাঁরা এই অন্ধকার দিনগুলি প্রত্যক্ষ করেন নি, তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতাগুলিই সামনে দেখছেন। তাই তাঁদের চিন্তায় পরিপক্বতা আসে নি। তথাপি ১৯৮২ সালে দ্বিতীয়-বার বামফ্রন্ট সগৌরবে জনগণের রায়ে রাজ্য-সরকারের ক্ষমতায় আসীন হল। কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা ১৯৭৭ সালের জনতা সদস্যদের সংখ্যা যুক্ত করলে প্রায় একই রকমের থাকে (৪৯)। বাম-পন্থার এই সুনিশ্চিত জয় বামপন্থার অনুগামী জনমানসে দৃঢ়মূল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল। পশ্চিম-বাঙলা তথা ত্রিপুরা-কেরালাসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যেও বামপন্থা, বামপন্থী দলগুলির কার্য-কলাপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে। কেন্দ্র দেশের রাজনীতির এই ভবিষ্যৎ কোনো ক্ষেত্রেই অস্বীকার করতে পারছেন না।

স্বৈরতন্ত্র, না গণতন্ত্র—এর বিচার বহুদিন পূর্বেই দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতির জগতে হয়ে গেছে। এর আবার নতুন করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিতন্ত্র না সমষ্টিতন্ত্র—তার বিচারও হয়ে গেছে। রাজতন্ত্র-প্রজা-তন্ত্রের যুগ পার হয়ে, সামন্তবাদী যুগ পার হয়ে, ধনবাদের সংকটীয় গণতন্ত্রের যুগে বিচরণ করতে-করতে পরবর্তী ধাপ সমাজবাদে বিপ্লবোত্তর উত্তরণ পরীক্ষিত হয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব চলছে তীব্র ধনবাদ আর সমাজবাদের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বে নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করছে সমাজ-তন্ত্র। ১৭টি দেশে এর প্রমাণ মিলবে। তাদের সমর্থনে নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১০৭টি দেশের ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্ব চলছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পতাকাতলে। ধনবাদের শেষ ভরসা যুদ্ধ, আর সমাজবাদের যাত্রাপথ সুগম রাখতে চাই শান্তি। এ লড়াইয়ে দেশের কোটি-কোটি মানুষের অভিযান শান্তির পক্ষে।

এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাঙলাসহ সকল রাজ্যেই বামপন্থার গণতন্ত্র-শান্তি-স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ যে এই দিকেই, তাতে কোনো সংশয়ের কারণ থাকতে পারে না।

কয়েকটি বাস্তব কারণে এই ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত :

প্রথমত, বামফ্রন্ট আভ্যন্তরিক বিরোধ কাটাবার শক্তি রাখে। এই ফ্রন্টে কয়েকটি বামপন্থী দলের সমষ্টি। এই দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসে স্থিরনিশ্চিতভাবে কংগ্রেসবিরোধী, দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস-বিরোধিতাই সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তা ছাড়া, যে দল যে পথের কথাই বলুন না কেন, সকলের ঘোষিত লক্ষ্য সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখানেও এঁদের মিলন ঠুনকো হতে পারে না। তবে রাজনীতিক অভিজ্ঞতায় বারে-বারে সমৃদ্ধ হওয়ারও প্রয়োজন আছে। একবার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধিত হলেই যে আবার ভুল হবে না, একথা বলা যায় না। তথাপি ঐক্যের শক্তির টানটাই প্রবল, সে কথা ভুললে চলবে না।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাঙলার মানুষ দেখেছেন, বহু

সমস্যার আমূল সমাধান না হলেও সাধারণভাবে বৈষয়িক দিক থেকেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অনেক কিছুই পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত কর্মচারী আর বুদ্ধিজীবীদের বেতনবৃদ্ধি এ রাজ্যে কম হয় নি। এই ন বছরে এঁদের দু হাজার কোটি টাকার আয়বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রামে ষাট কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, এবং গরিব ভূমিহীনরা বছরে পাঁচ-ছয় মাস কাজ পাচ্ছেন। গ্রামে-গ্রামে কুটিরশিল্পের, ক্ষুদ্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন হচ্ছে দ্রুততালে। বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রের এক্তিয়ার, তাই গত পঁচিশ বছর এর থেকে পশ্চিম-বাঙলা বঞ্চিত। তথাপি নিজ প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার এই শিল্পক্ষেত্রেও প্রাণপণ প্রয়াস চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের শতকরা ২৩ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করে ব্যাপক জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এই সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেকারি বৃদ্ধির কারণ কেন্দ্রের জনবিরোধী অর্থনীতিক নীতি। সংবিধানে প্রত্যেক যুবকের কর্মের অধিকারের স্বীকৃতিদানের সংশোধনী কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথামত প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। কর্মসংস্থানের অধিকার প্রত্যেকটি ধনবাদী দেশেও আছে। কর্মচ্যুতি ঘটলে, বেকার হলে তাঁরা সেখানে খুব ন্যূনতম জীবিকা-ভাতা পাবার অধিকারী। সমাজবাদী দেশে অবশ্য কেউই বেকার থাকেন না—কাজ দেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালায় এবং সরকারই দায়ী থাকে। যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বামফ্রন্ট যে দাবি করে আসছে—কংগ্রেস তা বারে-বারে অস্বীকার করছে—এটাও সকলে দেখছেন। এরই মধ্যে যথাসম্ভব কর্মসংস্থানের চেষ্টা বামফ্রন্ট সরকার করে চলেছে।

তৃতীয়ত, সমাজের প্রত্যেকটি অংশের মানুষ নিজ-নিজ দাবিদাওয়ার আন্দোলন চালাতে পারেন নির্বি-বাদে। আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকার এখানে স্বীকৃত। বিরোধী দল অথবা সংগ্রামরত মানুষকে কোনো ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করে কারাবন্দী করা হয় না। আন্দোলন আর সংগঠন গড়ার সম্পূর্ণ অধিকার সকলের জন্য স্বীকৃতই নয়, তাঁরা এই অধিকার ভোগ করছেন গত নয় বছর ধরে। শান্তিশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত। জন-গণের নিজ-নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁরা সুখেদুঃখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন বাম-ফ্রন্টের আমলে। এত গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো দিনই আমাদের রাজ্যের মানুষ ভোগ করেন নি।

চতুর্থত, পশ্চিমবাঙলায় বামফ্রন্ট আমলে জাতীয় ঐক্যসংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতীয়দের সকলের সমান-সুবিধা সুরক্ষিত। অন্য রাজ্যে গেলে দেখবেন অন্যরাজ্যের মানুষের চাকরি বা অন্যান্য সুবিধার সুযোগ নেই। সংকীর্ণ গোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এখানে নেই। সমস্ত রাজ্যের মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সকলেই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এ রাজ্যে। সাম্প্রদায়িক তথা জাতি-উপজাতির ভেদ-বিভেদের প্রশ্ন এখানে নেই, যদিও অবিরাম অপচেষ্টা চলেছে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পশ্চিমবাঙলার এই গৌরবময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের শক্তিকে কাজে লাগাতে। গণতন্ত্রসচেতন পশ্চিমবাঙলায় এই ধরনের বিষময় পরিস্থিতি অনুপস্থিত। এখানে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা হয়। দাঙ্গা, হরিজননির্যাতন, নারীনির্যাতন প্রভৃতি অনুপস্থিত। এ সবই ঘটছে এই কারণে যে বামফ্রন্ট দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

এইসব কারণেই বামফ্রন্টের ভিত শক্ত হয়ে রয়েছে। এই ভিতকে টলিয়ে দেওয়ার শক্তি কারও নেই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ এই পরিবেশ রক্ষা করার পক্ষে। তাই বামফ্রন্টের ভবিষ্যৎ সু-নিশ্চিত। এই অবস্থান সারা ভারতের মানুষ মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে চান। তাঁদের কাছে সারা ভারতে এই রাজ্য ও অন্য বামফ্রন্ট সরকার (ত্রিপুরা) গণতন্ত্র ও এগিয়ে চলার দুর্গবিশেষ। এই দুর্গ দুর্ভেদ্য, সমস্ত মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি বামফ্রন্টের অগ্রগতির মূল শক্তি। জনগণের উপর বিশ্বাস হারালে চলবে না। এই বিশ্বাসই বামফ্রন্টের আসল চালিকাশক্তি।

সে, সে-ই তো

নিখিলকুমার নন্দী

কেউ কারও মতো নয়;
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র;
তাই যে যায় সে একেবারে যায়;

একেকটা মৃত্যু যেন নক্ষত্রপাতের শূন্যতা
সপ্তর্ষির থেকে;
অথচ যে গেল সে মাত্র সাতজনের একজন ছিল না
অন্য অনেকের মধ্যেই ছিল ভিড়ের আকাশে ছড়ানো;

সে একা ছিল,
আশাহীন-আশ্বাসহারা-ভরসাশূন্য;
আবার আরেক অস্তিত্বে সে-ই
আশাবাদী, আশ্বস্ত ও আস্থাশীল
কারও-কারও কাছে
যুগপৎ অন্য ও অনন্য;
যখন সে ছিল তখন, যখন চলে গেল তখনও
তো আরো।

এমতাবস্থায়
তার যাওয়াটাকে ঘিরে এক বৃহৎ আয়না
মুহূর্তেই
আলোময় হয়ে শূন্যে যেন ঘুরপাক খেল, কিছুক্ষণ
অনেক ছায়া তার মধ্যে দুলে উঠল
জ্যান্ত প্রাণবন্ত ছায়ারা;
তারপর ভেঙে গেল অনেক টুকরোয়;
সবকটিতেই সে এক, একা, একা-একা,
অথচ 'সে আর সে নেই'?

ছিল কি কখনও, একটানা অনেকদিন?
ছিল না, তবু সে-ই তো ছিল!

ফিরে যেতে চাইলে

জয়নাল আবেদীন

ফিরে যেতে চাইলে
স্থির অপলক পরিবর্তনহীন একরাশ মুখ আমাকে শাসায়
অনিচ্ছুক ধূসর ডানা মেলে পায়রা উড়ে যায়।

ফিরে যেতে চাইলে
আলো এসে ঘুরে যায়, বাদল বাতাস কেঁপে ওঠে
নীল মাছি অন্ধডুমো শব্দ বারলির গেলাস ছুঁয়ে যায়।

ফিরে যেতে চাইলে
বউ ছেলে মেয়ে মুখ ছোটো করে, জানালার পাল্লা হেসে খুন হয়
ছেলেবেলাকার হারিয়ে-যাওয়া বিকেল ক্রোধ ছড়ায়।

দিনবদলের প্রতিটি নতুন দিন
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় আমার অবিশ্বাস্য দুর্বলতায়
শব্দের অজস্র রঙ, সমুদ্রের পাখি কাছাকাছি থাকে
অথচ আমার সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত
খোসা, কাঠ, শ্মশানের ছাই।

ঘুমভাঙার পর

সুবীর সেনগুপ্ত

ঘুমভাঙার পর, মাত্র একখণ্ড ভূমি
আর ধূসর আকাশের নীচে শুয়ে
ক্রমশ শুকিয়ে আসছে আমার শরীর
আর শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা,
ঘুমভাঙার পর আমার দুঃস্বপ্নেরা আবার ফিরে আসছে
অন্ধকারে ধস্তাধস্তি করে।

ঘুমভাঙার পর, আমার আর্তনাদ শুনে
পৃথিবী গুটিয়ে যাচ্ছে শামুকের মতো
আর সময় তার খরস্রোতে নদীর মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে
সময়ের শীতল প্রহর।
ঘুমভাঙার পর আমার শরীরের নীচে
চাপা পড়ছে আরো অসংখ্য শরীর
কাটা ছেঁড়া মুণ্ড সহ নগ্ন পাকস্থলী
আর নারী ও শিশুদের রক্তমাংসে সাজানো নরম ডালপালা
ভেঙে যাচ্ছে—অসহায় আর্ত চিৎকারে।

ঘুমভাঙার পর, এমন দুর্ঘটনার ভিড়ে
হারিয়ে যাচ্ছে—আমার প্রতিটি দিনের কোলাহল
আর রাত্রির স্বপ্নবিজড়িত পরমায়ু,
অথচ, আমার চোখে আশ্চর্য ঘুম
ঘুমের অবসাদ আর ক্লান্তিতে ক্ষয়ে যায় আমার হৃদয়
আর হৃদয়ের মুখঢাকা কালো মোমবাতি।

সরাও আঁচল, কলকাতা

দিলীপকান্তি লস্কর

সরাও আঁচল, কলকাতা ;
যেতে হবে
ছাড়ো বাহুপাশ, দাহ
ঘুম ও চুম্বনে আর কত দেবে ?
যুবা টাক, গুহা চোখ, লোলচর্ম ; এই তো অনেক !
সব রোদ, রক্তের সবুজভূমি ছিঁড়েখুঁড়ে খেলে ;
কী দিলে ? জীবন ?—সে তো দর্পণে হাসে না !
কাব্য ?—শুধু কাটাকুটি অন্ধকার ঘর ও বন্দর !
কোথায় উজ্জ্বল ছবি আমার অ্যালবামে !
না, আমার দুঃখ নেই, বিরহও নয়
সরাও রমণতাঁবু, বন্ধ্যা প্রজনন ;

নায়ের গলুই ধরে দুই হাতে ঠেলে দাও জোরে।

জলচর

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

কানের খোলে আর নাকের আঁচতালায় সরষের তেল ঢেলে কানাই পলা পুকুরের জলে টবাঙ করে ডুব দেয়। করাতের মতো তার ছেয়ালো শরীরটা কাদা-জলকে দুফালা করে দিলে এই চৈতমাসের ভরদুপুরেও কিছুটা ঠাণ্ডা উঠে আসে পাতাল থেকে। শরীরের ছালটি ভেদ করে হিম ঢুকলে আসান হয় কানাইয়ের। গামছাটাকে লম্বাপাতা করে দুহাতের চেটোয় ফেলে খুব কষে কচলে নেয় সে। তারপর বাঁ কাঁধে পেতে নিয়ে সূর্যপ্রণাম করে। তখন পলা পুকুরের মাঝখানে কী একটা যেন ঘাই মারে। কানাই চোখ তুলে ভালো করে দেখতে যেতেই ভোঁ।

ঘাটে মেয়েছেলেরা বুকের আগল ফেলে লাইতে নেমেছে। যে ছুঁড়ি তার বুক ভারী, যে বুড়ি তার দড়ি। ঘাটের উলটো দিকে একটা হেঁপো কুত্তা জল খায়, তারপর জিভ বের করে শরীর থেকে ঝরে যাওয়া রোদটুকু ঝেড়ে দিতে থাকে। এখন কেশপুর থানার সাসপুর গ্রামটি রোদে ভাজা হয়ে হলুদ পাঁপর। কেউ মুঠায় ধরে চটকে দিলেই শেষ হয়ে যাবে।

চোখ খুলে এইসব ছাখে কানাই। তারপর ঘাট-কোলের বড়ো তালগাছটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। যে দিকটা জলে ডুবে আছে সেই দিকের গোড়াটা তেড়ে ডোব করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে মাগুর-মাছটা। এটি তার ঘর। কানাই একমুখ জল নিয়ে গাছের গোড়ার সেই গর্তে ফোয়ারা ছোঁড়ে—অমনি মাগুরটা হাঁ করে বেরিয়ে এসে গভীর জলে ছুটে যায়। বুঝি ভাবে বৃষ্টি নেমেছে পৃথিবীতে, ভগবানের ছোঁড়া ফোয়ারাটি মাটিতে নামলে ওরা ঘন পুলকে খেল ধরে, তখন একঝাঁক মাছের শক্তি মানুষের চেয়ে ঢের বেশি।

পচা পাঁউরুটির দলা, বোলতাটিপ, মুগানি কেঁচো, মাধুঘাসের গিঁড়, পিঁপড়ে ডিম, খোলপচানি চটকে মণ্ড বানাচ্ছিল কানাই। গাছবঁড়শির ছুইলে ৪০ হাত মুগা ডোর আর দুটা কড়ে ৪টা কামারা কাঁটা খাটিয়ে ছিপটিকে একেবারে চাবুকটি করে রেখেছে। মাছ তো মাছ, মাছের চোদ্দপুরুষ উঠে আসবে বাপ-বাপ বলে।

কানাই মেছালের হাত, হাত তো নয় পরশুরামের কাতান। জাত নিব্বংশ হবে। মণ্ডটা তুলে নিয়ে শুঁকে ছাখে কানাই, 'আঃ, খুব খাবে।'

'ভাত দিয়েচি—'

দশহাতি লালপেড়ে শাড়িটা কোমরে বেশ আঁটো-সাঁটো গোছ করে ভাত বাড়ছিল বাতাসী। বাঁকই চালের মোটাদানা ভাত, একটু লালচে। শানকিতে পড়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াৎকার। বালতির জলে হাত ধুয়ে কানাই এসে খেতে বসে। হাঁটু মেরে, বাবু হয়ে, পদ্মাসনে। বাঙালির ভাত খাওয়া—এও এক দুর্গাপুজো।

'কাল্‌তার হাট থানি কালো কাছিম আনব, রাঁধিস তো—'

'না বাবা, সেই মাংস—'

'ক্যানে—'

'গন্দ—'

'তর রুচে নি, তবে থাক—'

'ক্যানে, তমার ভালো লাগে তো খেও—'

'ই আবার ক্যামন কথা, একলা খাব বলে কি আর সংসার—'

'আমি মাছ খাব—'

'উঃ, গরম তো লয়, যেমন মান্‌কা কামারের হাপর টানে বটে—'

'নেড়ী, তোর বাপকে একটুন হাওয়া কর্ তো মা। ইবার সন্‌কান্‌তির গাজনে তাল-বেল্‌লার পাখা কিনো তো—'

নেড়ী তার বাপকে হাওয়া করছিল। করতে-করতে বাপের গায়ে পাখা লেগে গেলে পাখাটি মাটিতে ঠুকে দিয়ে বলছিল 'ঘাট'। এটি সে তার মায়ের কাছে শিখেছে। লোকের গায়ে পাখা লেগে গেলে ঘাট বলতে হয়। তো নেড়ী বাপের পাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে পাখা দোলাচ্ছিল। বাপ বলল, 'কী রে মা, দু দাবকা খাবি নাকি?' নেড়ী মায়ের দিকে তাকায়, মা বলে, 'আর ক্যানে, লাও বসে পড় আর কি—'

মাথার ওপর রোদ কটকট করে। কাঁচা বাঁশের একটা পাতন পেতে কানাই পাছা পেতে বসেছে বঁড়শি হাতে। এককোমর জলে চারাকাঠি, তারই মসলায় এসে মাছ লাগলে কাঠির মাথাটি নড়ে। নড়ে আবার থামে; ঘাগি মাছ একবার চারে গুঁতা মারে তো চার তল্লাট ঘুরে আসে। জলের গভীরে মাছটির কথা ভেসে বেড়ায়, 'সামালে হে, কানাই মেছালের কাঁটা—'

মাছকে লোভ দেখায় কানাই, পচা গোবরজলে ছুঁড়ে দেয়। বড়ো সুখী মাছ, চেয়েচিন্তে খাবার খায়। বঁড়শি পেতে ফাতনার মাথায় চোখ গেঁথে বসে থাকে ঠায়। মৃদু ঠোকরায় মাছ, তুলতে গেলেই কলাটি। ফাতনার মাথায় এসে ফড়িঙ বসে, উড়ে যায়, আবার বসে—ভ্রম হয় কানাইয়ের—এই বুঝি মাছে টান মারে। বসে-বসে তার পাছা থেকে শেকড় নেমে যায়।

সখি রায়ের সংসারে সারা বছরটিই মাছ চাই। পুকুর ডোবা হাতে গুনলে তার কুড়িটি। নামে বেনামে জমি ঢের; কালা জমি বারো বিঘা, শোল জমি একচল্লিশ বিঘা সাত কাঠা, নাবালের আট কাঠার জোতটি তো তার বর্ষার জলে ডুবে থাকে। মাঘ মাসে সেখানে 'হাই-ইলডিং' ধানের চাষ হয়। ধানে মানে একসা হয়ে ভুঁড়িটি এলিয়ে দিয়ে দলিজের তক্তাপোশে বসে থাকে রায়। পঞ্চাতের লোকেরা তার নামে খেপে লাল। তো তার গিন্নীর মুখটি বড়ো সোহাগি, জিভটি তার মাছ না পেলে ছোটো হয়ে যায়। ছ্যানাপানা-দের নলা ঢের, মাছ-মাংস-দুধ-ঘিয়ে মানুষ তারা। বড়ো ব্যাটা, মেজকা থাকে 'কলকাতায়', বড়ো-বড়ো চাকরি করে। এমন-কি বিধবা বুড়িটি সেও সৃষ্টিছাড়া—অমাবস্যা নাই পূর্ণিমা নাই ড্যাঙ-ড্যাঙ করে সবার সামনে মাছ খেতে থাকে। পুকুরে জাল ফেললে ভালো, নাই তো তিন জন মেছাল আছে বাঁধা বারমাস্যার মতো। কানাই, বায়েন আর যুগল হাজারী। তারা

সারাদিন পুকুরডোবা ঘুরেফিরে, মাছ ধরে, সন্ধ্যাবেলা রায়-বাকুলের উঠনে এসে বস্তা আজাড় করে দেয়। বছরে খোরাকি ছাড়াও নগদে মাইনে পায় তারা।

'কী হে বায়েন, কটা মিলল ভায়া—' কানাই বায়েনের দিকে চেয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ বড়শিটা সপাত করে ঘিঁচ মারে—, 'যাঃ, খুলে গেল, বড়োটাই ছেড়ে গেল—'

'কী ছিল গঅ—'

'রুই নাকি মিরগাল কে জানে—'

তা ভাই, পুকুর-পালে আর মাছ নাই—'

'সে কী গঅ, বাবুরা খাবে কী—'

বাঁশের মাচানে বঁড়শি ঠেসিয়ে রেখে কানাই এসে বসে কঁ্যাদগাছের ছায়ায়। তারপর হাত পাতে। বায়েন বিড়ি দেয়। ছুজনে টানতে থাকে সুলুক করে। কানাই পিছনে হাত পাঠিয়ে তল-কোমর চুলকতে থাকে।

'কী হল, দাদ নাকি—'

'না হে—উসব চম্মরোগ আমার নাই ভায়া—'

'তবে? কী অমন ঝুনতে থাক একনাগাড়ে—'

'ছ্যাখো না, কাল লইয়ার জলে কোমর ডুবিয়ে সারাটা দিন বসেছিলম। পুকুরটায় যত ফোলই তার চে ঢের বেশি জলবিঁদা। ঠ্যাঙগুলো কেটে-কেটে ফুলিয়ে দিয়েচে। ছ্যাখো না, এই যে চাকলা-চাকলা হয়ে দাড়িয়ে গেছে বিষ।'

'সুনতেল মেখে জলে নাম নি ক্যানে—?'

'দূর! উ তেল কি আর তেল আছে—ভেজাল। সবকিছুতেই ভেজাল থাকে আজকাল।'

সন্ধ্যা নাগাদ কানাই এসে সখিবাবুর ভিটের উঠনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে মাত্র ছুটি কই মাছ, 'না গঅ মেজোমা। মাছ আর নাই গাঁয়ে ভিতে। ইবার গঞ্জ থেকে মাংস আনো। আনো আর খাও। সারাটি দিন রোদে জোনারপোড়া পুড়ে এই ছুখান কই ধরেচি মোটে। লাও—'

'কার পাতে দিই, কার পাতে নাই—'

'জল নাই। ফসল নাই। পুকুর-লালায় শুধু পোক ভাসে গ মা, পোক ভাসে—'

'তবে যে যুগল হাজারী বলল, পলার পাড়ে তাল-গাছটার গোড়ায় নাকি এক মস্ত মাগুরমাছ বাসা বেঁধে আছে—'

কানাই এবার মুখে রা কাড়ে না। মাছটি তার শখের মাছ। সে যে দানাপানি দিয়ে পুষেছে তা নয়। তবে হক্‌সবার পুকুর, ঘরের চৌকাঠ পেরলেই ছ্যাখা যায়; ভাত খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে রোজ সে জলের ফোয়ারা ছুঁড়ে মাছটির সঙ্গে খেলতে থাকে। আদর পেয়ে মাছটা তখন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে সাঁ করে, তারপর গভীর জলে চলে যায়। মাছধরা যার পেশা, পুকুরখেদানো যার নেশা, সারাদিন যে ছিপ নিয়ে-নিয়ে পুকুরপারে ঘুরে মরে তারও একটি স্বপ্নের মাছ আছে। সেই মাছটিকে ধরে আনার ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনলে একা, বোকা, অপদার্থ কানাইয়ের চোখে মুখে হেজে-থাকা জীবনের কালি ফুটে ওঠে। আহা, আজ যদি তার জমি-জিরেত থাকত তবে ওই মাছটির নাকে একটা রুপার মাকড়ি পরিয়ে রাখত। লোকের ঘরের মাছ ধরলে যার পেটটি চলে তার রূপও নাই রুপাও নাই। ভগবানও তাকে ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

'ও কানাই—'

'আজ্ঞে মেজোমা—'

'সেই মাগুরটি বাছা ধরে আনো দিকি। রথীনের মেয়েটা এসেছে কলকাতা থেকে। জানো বাছা, জ্বর থেকে উঠে খ্যাংরাকাঠিটি হয়ে গেছে। ঝোল খেলে যদি হাড়ে মাস আসে। শহর-বাজারে মাছটা তাতেও যদি ভেজাল থাকে তবে মানুষ খায় কী বলো দিকি—'

মেজোগিন্নির কথা শুনতে-শুনতে কানাইয়ের মনে পড়ে যায় বাতাসীর কথা। সেই কবে থেকে বউ বলছে, 'নেড়ীটা আমার হাড়ে আর মাসে হয়ে গেছে। অসময়ে মায়ের খেলা—পেটে যদি ছুটা ভালোমন্দ দিতে না পারি তো পরে না আবার কপালে হাত চাপড়াতে হয়। কাঁচকলা আর লাউডাঁটার ঝোল খাবে, মাগুরটা ধরে এনে দও দিকি।" কানাই গিয়ে মাছটাকে গভীর জলে খেদিয়ে দিয়ে এসে বলেছে, 'দূর, সে কি কম ঢ্যামনা মাছ? ছ্যাখো না—বুড়া আঙুলটা ক্যামন বিঁধে দিয়ে পালিয়ে গেল। উঃ! একটুন চুন-হল্‌দা সিদ্ধ করো দিকি, যন্‌তনা সহ্য হচ্ছে নি, বোড়ো জ্বলন—।'

'কী বাবা কানাই, মাছটা ধরে এনে দিবে তো—'

'হ্যাঁ মা। কালকে দেখি ব্যাটাকে কী করে জব্দ করা যায়—'

সখি রায়ের তিন বউ। প্রথম পক্ষেরটি মাসভজা পোয়াতি অবস্থায় বিয়াতে গিয়ে টেঁসে গেল। মেজো-গিন্নী গাঁয়ে বসে চাষবাস ছ্যাখে। ছোটকি বয়সে কচি, সে গিয়ে থাকে কলিকাতায়। সখি রায় লোকটি ভালো। বিয়ে করেছে যেমন, তেমন পালবার ক্ষমতা রাখে। কবজির জোর আছে। ছোটকির কাছে যদি শুক্লপক্ষ কাটায়, মেজকির কাছে তবে কৃষ্ণপক্ষ। সকালে উঠে, স্নান সেরে, কাচা ধুতিটি পরে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা দেয়। পোষা বামুনে এসে, মন্দিরে বসে অং বং চং করে দিয়ে যায়।

'না গঅ মেজোমা, মাছটিকে তো ধরা গেল নি। শালা ঢ্যামনা মাছ—ছায়া দেখলেই পগার পার—'

'তবে কী হবে বাছা, নাতিনটি যে আশা ক'রে বসে আছে—'

ঘরে ফিরে কানাই বউকে বলল সব কথা। বচসা করল। বলল, 'মেজোমার নলা খুব ধার। জলের পোকটি পর্যন্ত ধরে খাবে। রক্তের শুকতো ছাড়া মুখটি তার গোমরা হয়ে থাকে।'

জ্যোৎস্না উঠেছে জামবাটির মুখের মতো গোল। তারই ছই নেমেছে পৃথিবীতে। মধ-ছুয়ারে মাছুর পেতে কানাই শুয়ে আছে। বাতাসী পা ছুটি মিলে ধরে আহ্লাদে বসে-বসে চুল ঘেঁটে উকুন আনছে আর মারছে পটপট। নেড়ী ঘুমে কাদা, তুলে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিলেও ভাসতে থাকবে লখীন্দরের লাশের মতো, তবু চোখটি তার খুলবে না। বাবলা চিটে চিটিয়ে আছে।

'এই—'

'কী—'

'মাছটা ধরে আনো, নেড়ী আমার ঝোল খাক—'

চাঁদের ওপর চোত-বোশাখের মরা মেঘ সরের মতো পাক খাচ্ছে। কখনও কিরণটুকু তেরছা নামে। আবার কখনও-বা চাঁদ খেলতে থাকে। তখন আকাশ জুড়ে ছেনাল মাগীর ধারালো দাঁত ঝিলিক মারে।

বাতাসী হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি তুলে দিয়ে ডৌল জাং বের করে জ্যোৎস্না মাখছিল। তার খোলা বুকে খানিকটা আলো ঢুকে পড়ে ঠিক যেন বাঙলা গোলা সাবান। বোঁটাটি ধরে চুলকোতে-চুলকোতে বলে, 'উঃ! ঘামাচি দেখেছ পাকা-পাকা বরনের মতো। জল নামলে হায় করি।' কানাই চাঁদের দিকে চেয়ে বলে, 'ছ্যাখুনি সকালে রান্নাশালে পিঁপড়ারা ডিম বইছিল। বানা হবে ই বছর। গাছে ভালো আম ফলেছে। ঝণ্টার দোকানে সেদিন বিভূতা মাস্টার বলছিল—কুথায় নাকি বাঁশগাছে ফুল ফুটেছে। মহা-মারী হতে পারে।'

পরের দিন ছুপুরবেলা খিড়কি পুকুর থেকে কানাই সুত খেলিয়ে তুলল একটা প্রকাণ্ড কাতলা। ঝুপির সবকটা কাঁটাই হজম করে মাছটা একেবারে নেতিয়ে গেছে। মাথাটা একটা কাছিমের মতো থাম্বা। সখি রায়ের উঠনে গিয়ে ফেলে দিতেই কাতলাটা ভড়কে গিয়ে দিল তিন লাফ। অমনি কানাসি ফেটে যত রক্ত। সখি রায়ের সেই কলকাতার নাতনিটি এসে মাছটাকে আদর করে বলল, 'আহা মরে গেল যে—'

সখি রায়কে তখন ভগীরথ আর ফ্যালারাম দলে-দলে কোবরাজি তেল মালিশ করছিল। আনন্দপুরের নব কোবরাজের নিজের হাতে তৈরি বিষ্ণুতেল। ঠিক-মতো ব্যবহার করলে 'সপ্তব্যাধি নাশ' হয়। মাছ দেখে রায় বলে উঠল, 'আরে করেছ কী! ওগো ও রথীনের মা, কানাইকে আড়াই সের মুড়ি দিয়ে দাও!'

সখি রায়ের বউমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে কলার আঁতের মতো পেটটি দেখিয়ে গেল।

ফিরে এসে পলা পুকুরের জলে ডুব দিয়ে স্নান করে কানাই। গাঁয়ের আটকপালি মাদের পোড়া-মুখো ছেলেপেলেরা দেদার সাঁতার কেটে জল ঘোলা করে। এক ডুবে কে মধ্যিখানের পাঁক তুলে আনতে পারে তারই লড়াই চলে। ঘরে এসে কাঁকুড়ের ঝাল দিয়ে ভাত খাচ্ছিল কানাই। এমন সময় নেড়ী কোথা থেকে দশটা পাঁচের লোকালের মতো এসে ঝকঝক ক'রে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'বাবা গ, ও বাবা—'

'কী রে মা, খাবি নাকি চু-গাল—'

'নুনা—'

'তবে—'

'সেই মাগুরটা ধরে লিয়ে গেল—'

'কি—ঈ,—কে—'

'কালী বামুনের ছ্যানাটা, পদা, জ্যাস্তা কেঁচা দিয়ে টাঙা রেখেছিল। আর খাবি তো খা সেই মাগুরটা। উঃ, লাল টকটক করছে, পাকা মাছ, খুব খাবে—'

বেশ আনন্দে খাচ্ছিল কানাই। সারাদিনের পর নিত্যিসেবা, ঘরগেরস্থ গোছ করে তবে খেতে বসা। শান্তিতে খাচ্ছিল কানাই। নেড়ীর মুখ থেকে কথা কটি শোনা মাত্র একবারের মতো মরে কেঠিয়ে গেল। গলাখাকারি দিয়ে আবার খেতে থাকলে বাতাসী নিল এক হাত, 'হল তো, ঠিক হইচে। বেশ হইচে। কতবার বললম, আনো তো মাছটা ধরে—নেড়ী আমার ঝোল খাক। কে শুনে কার কার কথা। যেন কুত্তা ঘেঘাচ্ছে। অমন পাকা মাছ, আদা-মাগুর করলে হায় করে মুখ ছাড়াতম। কে শুনে কার কথা। ভালো বললে কানে মন্দ লাগে, মাগের কথা বাসি হলে মিঠা হয়। হায়, হায়, কেমন সুন্দর মাছটা গঙ্গ, শালা বামুনের ব্যাটা খাবে। কথায় বলে, কপালে থাকলে গু, কাগে এনে দেয়—'

খেয়েদেয়ে কানাই পলা পুকুরের ঘাটে মুখ ধোয়। মনটা তার শুকনো সরষেগাছের মতোই ঠনঠন করে। অভ্যাসবশে একগাল জল নিয়ে সেই তালগাছটার গোড়ার গর্তে ফোয়ারা ছোঁড়ে। অমনি পাকা মাগুর মাছটা সাঁ করে বেরিয়ে এসে গভীর জলে চলে যায়। মরা দুপুরের রোদে তৎক্ষণাৎ বাতাসীর নাকছাবির পাথর দুটির মতোই হু হু করে জ্বলে ওঠে কানাইয়ের চোখ। মরে-থাকা কানাই বেঁচে গিয়ে উঠে বসে।

২

'নদীধারে রেখেচি ঘুনি,
মাছ পড়েছে চুনাচুনি।'

নেড়ী আর বগারা বউ ডু-ডু খেলছিল। নেড়ী হয়েছে বউ, বগা পাহারা দিচ্ছে বউঘরে দাঁড়িয়ে। লেউল, সন্তোষী, নেপাল ডাক দিতে-দিতে বউ আনতে আসে। বগা বায়েনের বড়ো খোকা। নেড়ী যখন কোলে-কোলে বগা তখন মায়ের আঁচল ধরে গরাইদের দোকানে গুড় আনতে যেত। বয়সমতো বাড়ে নি। ক্যাঁট আলুটি হয়ে আছে, দেখলে বলবে, দুধের শিশু হামা দেয়।

বায়েনের বউ আনন্দপুরের ঝিউড়ি। শহরের লোক, তাই তার নামটি ছিল বেশ, অণিমা। দেখতে কিন্তু টেপিরও পরে। এখন সেই নাম নাই, গাঁয়ে থেকে-থেকে হেজে গেছে তার নামটি, নষ্ট হয়ে গেছে। লোকে বলে বায়েন-বৌড়ি। এই শীতে গা ফেটে গিয়ে পশুমাটির চকলা উঠে আসে। তো বাতাসী, আর অণিমা দুজন দুজনের হলুদফুল। ওরা বসে-বসে রঘুনাথের মেয়ের কথা বলছিল, সে নাকি বিশ্বনাথের সঙ্গে রাতের বেলা কলাতলায় আসে। সারারাত থেকে ভোর-ভোর ঘরে যায়। ঘরের লোক বাকবিতণ্ডা শুরু করলে গলা তুলে মাগী চেঁচাতে থাকে, 'ঘাট বসতেও যাব নি নাকি। কথায় বলে—'চোরের মায়ের মুখ দড়ো, ঘন ঘন যায় শীতলা মাড়ো।' তো তার পেটটি নাকি আজ বেশ বড়সড় দেখাচ্ছিল। কী

জানি বাবা, সাপ আছে নাকি ব্যাঙ আছে। হরির থানে অকাজ কুকাজ! গড়টি মা ওলাইচণ্ডী।

'যাস গ, আমার ঝিয়ের দুয়ার দিকে—'

'যাই তো, টেইম কি আর পাই—'

'কত্তা কী করে—'

'কী আর করবে, চিতপাত হয়ে নাক ডুচ্যাচ্ছে—'

'মাছ ধরতে যায় নি—'

'মাছ আর আছে নাকি, উদ্ বিড়ালে শুধু হেগে রেখেচে। তেপহরে ঘুম থেকে উঠে মুখে চোখে জল-ছিটা দিয়ে রায় বাখুলে গিয়ে বলবে, সারাদিন রোদে ভাজা হয়ে পেলম নি বাবু। দেখি কাল কী হয়—'

ঘরে আসতে-আসতে বাতাসী ভাবে সবাই বেশ বুদ্ধিমত কাজ করে। 'আমার লোকটিই' যা যুধিষ্ঠির। মিথ্যা বললে মহাপাপ। 'কপালগুণে গোপাল জুটেচে আমার'—হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেল।

গোহাটা কেশপুরের পশ্চিম মাঠে বসে সপ্তাহে একদিন, রোববার। হেলে দুটি আঁদাত ভেঙে এখন বেশ তেজালো, বয়সে ৬ট। সিংগুলিকে তেল মাখিয়ে ঝকঝকে করে নিয়ে গকুল চলেছে হাটে। পুকুরের পাড়ে কানাইকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে হেলা দুটির দাঁতগুলিকে রোদ খাইয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হে মেছাল, নজর কুথায়—'

'আর বল্ ক্যানে ভাই—'

'কী কর—'

'মাগুর ডোবে খাঁচি ভরচি—'

সকাল। মুখে চোখে জল দিয়ে নিমডাল ভেঙে দাঁত ঘষছিল কানাই। পরে মুখ ধুয়ে ছাতির লোম-গুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে ঘরে আসে। বাতাসী পানতা ভাতের সঙ্গে রোয়া পেঁয়াজ ছাড়িয়ে খেতে দেয়। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা। উনুনে আগুন থাকলে ঝলসে দিত। সাত সকালের পেট, চাখনা বিনে ঢুকতে চায় না।

তুলসীতলায় গোবরজলের ন্যাতা টানতে গিয়ে বাতাসীর মনে পড়ে যায় আজ লক্ষ্মীবার। আতপ পিটুলিতে জল ঢেলে মা-লক্ষ্মীর পা আঁকতে বাকি আছে। তুলসীথানের পুয়াগাছটা আবার ছাগলে মুড়ে খেয়ে গেছে। হায়, হায়! বাখুলে বুঝি সাত-পোয়া পাপ পড়ল। এবার আবার বামুন ডেকে 'পাশ্চিত্তির' কর। তবে গে খালাস। তারও হ্যাপা ঢের। দুটা লাল গামছা, বাস্ত মায়ের শাড়ি, আড়াই সের আতপ চাল, ষোলো আনা দক্ষিণা, বামুনের সিধা।

পোষ মাসের মাঠ, কাটা তোলা শেষ। ঘরে-ঘরে হাতি আসে গাঁ-গেরামের হাল দেখতে। চাষীরা মন খুলে মা-লক্ষ্মীকে দেয়। মাহুতের নির্দেশমত হাতি শুঁড় উঠিয়ে পরিবারের জয়গান করে, 'গিন্নী মা কী,—ঝ্যা।'

আধমন মতো আতপ চাল ছিল। বাতাসী ঢেঁকিতে কুটছিল। পাড় দিচ্ছিল সেই হলুদফুল বায়েন বৌড়ি। পিঠের পরব দোরগোড়ায়। গাঁ-গেরস্থের এখন ঘাম মাটিতে ফেলার অবসরটুকুও নেই। কোথা থেকে নেড়ী ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'পমিলা আমাকে মেরেচে, এই এই পিঠটায়—গুমগুম করে কিলিচে।' মারপিঠের কারণ জানতে না চেয়েই বাতাসী গলা খুলে শুরু করে দিল, 'ওই হাতে চুঁটা হবে, কুঠা হবে, পোক পড়বে, গলে-গলে পড়বে ওই হাত। নাড়ী—সব্বনাশী।'

এবার চাষে ভালো খড় পড়ে নি। বর্ষার আগেই চাল ছাওয়া দরকার। খড়ের দাম দাউ-দাউ করে বাড়ছে। এখন ৪৪৫ টাকা কাহন। ঘরের চাল নষ্ট হয়ে গেছে। ঝরে-ঝরে দেয়াল পড়তে থাকবে। কানাই বাটুলকে ঠিকা চুক্তি করে এনেছে। বাড়ুইয়ের বেতন বেশি। তাই সে জোগাড়দারের কাজ নিজেই করছিল, বাটুল চালে উঠেছে। কানাই খড় তুলে দিতে থাকে। খড়ের আকাল, তাই এ বছর গোঁজা দিয়ে কোনোমতে ঘরটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা। আসছে বার খুলে ছাইবে। এবার শুধু তরসতরি হাতে 'উদভটি' ছেয়ে বর্ষাটাকে ঠেকিয়ে রাখো। সকাল

পালি কাজ হয়ে গেলে হাতবঁড়শিটা হাতে নিয়ে কানাই গিয়ে বসে পদ্মপরাজের ঘাটে। 'কাগের চোখের মতো জল, শালা মাছ খাবে না কলা খাবে।'

সারাদিন পুকুরপাড়ে বসে-বসে কানাইয়ের পিছন থেকে ঝুরি নেমে যায় মাটিতে। বাসি বিকেলে সে যখন হাঁটতে শুরু করল তখন কোমর বেঁকে গিয়ে ধানকাটা কাস্তে। রায় বাথুলে এসে শুকনো মুখে ঢুকল কানাই। মনে-মনে ঠিক করেই এসেছে সে মিথ্যে করে বলবে, উঃ, জাঠকাঠের মতো মাছ—সাংঘাতিক মাছ—ডোর কাঁটা সব ছিঁড়ে ছুঁড়ে গিয়ে সটান মধ্যিখানে বসে গেল,—উঃ, মাছ বলে মাছ—জল ভড়ভড় করে ভুরি ছাড়তে লাগল। দেখি শালাকে, কাল জব্দ করবই করব।

কিন্তু সে কথা বলতে হল না। বাথুলে গিয়ে দেখল যুগল হাজারী একটা প্রকাণ্ড মাগুর ধরে এনেছে। মেজোগিন্নী আনন্দে খলবল করে বলে ওঠে, 'দেখলে তো কানাই, মেছাল আর কাকে বলে—তোমার দ্বারা তো হল নি, যুগল ঠিক তার মেজোমার টানটি জানে।'

কানাই দেখল সখি রায়ের ছোটো বউ, সেই যার পেটটি মর্তমান কলার আঁতের মতো, সে মাছটির পেটে আস্তে করে হাত বোলাচ্ছিল। পাকা মাছ, হলুদ মাছ। মাথাটা পাথর হয়ে গেছে। লেজটা নেতিয়ে গিয়ে আস্ত একটা শালপাতা।

হঠাৎই কানাইয়ের নাক থেকে একটা হাঁচি বেরিয়ে আসে সট করে। অমনি ভড়কে গিয়ে সাতকালের বুড়ো, ভীতু মাছটা দিল তিন লাফ। আর কাঁটাটা গিয়ে ঢুকবি তো ঢোক ছোটো বউয়ের হাতে! যন্ত্রণায় ছটকটিয়ে বউটা আঙুল টিপে উঠে দাঁড়ায়। হাকন্দ ফেলে দেয়। এমন সুন্দর মেয়েছেলের গলাটা শুনলে কার না বদহজম হয়। আর বুক থেকে শাড়িটা পড়ে গিয়ে মাছের লালার সঙ্গে চিটিয়ে গেল খানিক।

বউটার দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন একটা ব্যথায় টাটাতে শুরু করল কানাইয়ের শরীর। বুক নয়, পাকা ডাবের পিঠ। বাতাসীর বুক ছুটোর কথা মনে পড়ে যায় তার। ছোটোলোকের শরীর সে তো শরীর নয়, কালো সাপের পিঠ। খসখস করে। বাবুদের মেয়েছেলেদের বুক নাকি সোনার জলে ধোয়া। একবার দেখলে চোখ ফেরানো দায়। পাকা টকটকে জামিরের মতো মাই ছুটা টলমল করছে। কানাইয়ের শরীর খারাপ করতে ইচ্ছে করে। বউটার গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাধ্য নেই জেনে বলে বসে, 'ও মেজোমা—একটুন আখড়পাতা ছিঁচে দিয়ে দও, আসান পাবে এক্ষুনি।' বউটির চোখ ছুটো জলে গুলে গিয়ে একসা। বলে ওঠে, 'না বাবা, ওসব পাতা আমি নেব না।' কানাইকে লক্ষ করে মেজোগিন্নী বলতে থাকে, 'যাও না বাছা, একটু পাতা এনে ছিঁচে, লাগিয়ে দিই।' কানাই দৌড়ে গিয়ে পাতা আনে, হাতের চেটোয় ফেলে মুহূর্তে পিষে নেয়, তারপর বউটির মুখোমুখি বসে। বলে, 'লাও।' বউ বসে ছিল, হুঁশ নাই। পাতা পেয়ে লাগাতে লাগল। কানাই সুযোগ পেয়ে বুকজোড়া আরও ভালো করে দেখল, যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে। তার চোখ থেকে ছোটো-ছোটো ছুটো জিভ বেরিয়ে এসে সবটুকু চেটেপুটে খেল। তারপর ঘরে ফিরতে-ফিরতে মাছটার কথা ভেবে চুপ হয়ে গেল সে।

মাছটার জন্য কানাইয়ের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাত হতে বেশ দেরি, সবে মাত্র চালে ফুট ধরেছে। খালি ফাঁকা মাঠে সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া মনটিকে বয়ে বেড়াচ্ছিল সে। মন খারাপ, তবু কেন যে সাসপুরের মাঠে অকারণে কলকেগাছে হলুদফুল ফুটছিল তা গাছই জানে। কানাই শুধু জানে যে এখন আকাশে চাঁদ উঠেছে সেই ছোটো বউয়ের বুকের মতো।

রাতে ভাত খাচ্ছিল কানাই। খেতে-খেতে বউকে বলল মাছটার কথা। বউ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'মাথায় কি কুমোর পোক ঢুকচে নাকি? সেদিন তো কাশীবামুনের ব্যাটা মাছটাকে ধরে লিয়ে

গেল। আজ আবার—? একটা মাছ ক'বার ধরা যায় শুনি? কথা পায় নি, কথা বলছে—।'

'না, তুই বিশ্বাস কর কালকেও আমি মাছটাকে দেখেছি—'

'পিত্থিমে কি ঐ একটাই মাছ নাকি—'

অনেক হজরবজর করেও কানাই বাতাসীকে বোঝাতে পারল না যে, সেদিন মাছটা আসলে মরে নি। পদা মারতে পারে নি। কিন্তু কে কার কথা বোঝে। দুনিয়ায় সবাই পণ্ডিত।

ভাত খেয়ে হাত ধুতে গেল কানাই। জ্যোৎস্না ফটফট করে চারদিকে। সে এক অন্যরকম জ্যোৎস্না। মুখ ধুয়ে, একমুখ জল নিয়ে স্বভাববশে কানাই ছুঁড়ে মারে সেই তালগাছটির গোড়ায় থাকা গর্তটিতে। অমনি সেই মাগুর মাছটা সাঁ করে বেরিয়ে এসে গভীর জলে চলে যায়। কানাইয়ের মরে-থাকা প্রাণটা সড়াত করে বেঁচে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না ছোটো বউয়ের বুক আর মাগুর মাছের মুখের সঙ্গে একসা হয়ে যায়। সাসপুরের মাঠে কলকেগাছে আবার একটি ফুল ফুটল টুপ করে। কানাই পরিষ্কার শুনতে পেল সেই শব্দ।

৩

ভাত খাচ্ছিল কানাই। ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল। বহুদিন পরে তার বউ বাতাসী বেশ তরিজুত করে ঝোল রেঁধেছে। ঝাল একটু বেশি দিয়েছে বটে, তাতেই কিন্তু নেড়ী বেশ গাপুস-গাপুস খাচ্ছে।

একমনে ভাত মাখছিল কানাই। এতদিন ধরে জল ঘোলা করে দিয়ে যে মাগুরটা পালিয়ে যেত সেই মাগুরটার ঝোল দিয়ে ভাত। বাতাসী এখনও খেতে বসে নি। নেড়ী আর নেড়ীর বাপের খাওয়া হয়ে গেলে সে সাধারণত খেতে বসে।

'কী গ, ক্যামন হইচে—'

'ভালো—'

নিম-আনন্দে উত্তর দেয় কানাই। খেতে-খেতে বিষম খায়। পাকা মাছের কাঁটা, মাথাটি আবার কত্তাকে দিয়েছে বাতাসী। জীবনে আপন বলতে তো ওই একটাই লোক। শক্ত কাঁটা, দাঁতের জাঁতিতে পড়লে কুড়কুড় শব্দ হয়। অথৈ আনন্দে গরগর করে বাতাসী বলতে থাকে, 'ছাখো দিকি—কার ভাগ্যে কে খায়? কত লোকই তো মারল, খেল; হজম করতে পেরেচে? আমার নেড়ীর দাঁতের জন্যেই তো জন্মেছিল মাছটা। কী মা, পেটটা ভরেচে তো?'

নেড়ী আজ দুটি বেশি ভাত খেয়েছে। পেটরোগা মেয়ে, এখন পেটটি ফুলে গিয়ে ঘট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে কানাই বলেছিল, 'আর খাস নি মা, পরে আবার হাগবি।' তাকে থামিয়ে দিয়েছিল বাতাসী, 'দুটা যদি খাচ্ছে তো খাক না, নিজেরই তো মেয়ে নাকি অন্য কারো।' কানাই আর কোনো কথা বলে নি।

আজ আর কোনো ভুল হয় নি কানাইয়ের। নিজের হাতে কোদালে কেটে গর্তের চারপাশে বাঁধ দিয়েছে সে। বাতাসী জল ছিঁচছিল, জলটুকু মরে যেতে গর্তে খাঁচি ভরেছিল সে। অমনি মাগুরটা বেরিয়ে এসে কাদায় লেপটালেপটি। ধরতে পারে নি বাতাসী, দাপটে ঘরের লোকটিকে বাঁকাতে পারলেও মাছটাকে সে রীতিমত ভয়ই পেয়েছিল। বলে উঠেছিল, 'ধরো না গঅ—।'

তো নিজের হাতেই মাছটিকে ধরে এনেছিল কানাই। চোখের সামনে আঁশবঁটিতে ফেলে ঘসর ঘসর কেটেছে বাতাসী। বায়েনের ঘরে দু চাকা পাঠিয়েছে। আজ আর কোন ভুল হয় নি কানাইয়ের।

জগতে এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েমানুষের কথায় ওঠে বসে, যাদের কোনো শিরদাঁড়া নাই। তাদের বলে মাগভেড়ুয়া। কানাই সেই জাতের লোক। বউয়ের কথায় নিজের গলাতেও ছুরি বসাতে পারে।

বউয়ের হুকুমে যা করেছে সবই মিথ্যা। আসলে

কিন্তু মনে-মনে কানাই মরে গেছে। এখন ঘাটে হাত ধুতে এসেছে তার কেঠিয়ে-থাকা শরীরটা। মাছটি নাই, তাই পুকুরের জল গরম হয়ে আছে। সেই গরম জলে কুলকুচো করে কানাই, মুখ ধোয়। কাকের চোখের মতো ছাঁকা, পরিষ্কার, স্থির হয়ে থাকা জলে নিজের ছায়া ছাখে। জলের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটা কানাইকে দেখে কিন্তু সে অবাক হয় না। সে তো মরে আছে, অবাক হবে কে? রোজকার মতো মুখ ধুয়ে মূর্খ কানাই একমুখ জল নিয়ে ছুঁড়ে মারে তালগাছের গোড়ায় থাকা সেই গর্তে, তার খোলা বুক থেকে এককোঁটা ঘাম প'ড়ে পুকুরের জলে গিয়ে মিশে যায়, জল পেয়ে মাগুর মাছটা কানাইকে অবাক করে দিয়েই সাঁ করে গভীর জলে চলে গেল। তড়াক ক'রে বেঁচে উঠে কানাই দেখল পুকুরটাকে। তার বুক থেকে ঘামের জলটুকু ঝরে পড়ে পুকুরটার জলের তল আরও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন

গত কয়েক বছর ধরে যে প্রেসে ত্রৈমাসিক, এবং পরে মাসিক, 'চতুরঙ্গ' ছাপা হচ্ছিল, সম্প্রতি সেখানে বেশ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। গত বছরের মাঝামাঝি থেকে 'চতুরঙ্গ' প্রতি মাসেই অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছে। মে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে ওই প্রেসের লাইনো বিভাগে ধর্মঘট হয়। অগত্যা মে ১৯৮৬ সংখ্যা—৪৭তম বছরের প্রথম সংখ্যা—হাতের টাইপে ছাপতে হয়, এবং তা প্রকাশিত হয় ওই মাসের একেবারে শেষ দিনে।

১ জুন ১৯৮৬ থেকে ওই প্রেস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

কলকাতা শহরে আমরা এমন কোনো লাইনো-প্রেসের সন্ধান পাই নি যেখান থেকে নিয়মিত, উন্নতমানের কাজ পেতে পারি। বস্তুত, কলকাতায় ভালো লাইনো-প্রেসের সংখ্যা কমে আসছে।

এই অবস্থায় আমাদের হাতের টাইপেই যেতে হল। হাতের টাইপেও যাতে মুদ্রণের উৎকর্ষ সম্বন্ধে চতুরঙ্গের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা সজাগ থাকব।

বিপন্ন মুসলিম মহিলা

এস. এ. মাসুদ

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখে রায় দিলেন—ফৌজদারি আইন ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী মুসলমান স্বামী তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণের খরচ দিতে বাধ্য, যদি ওই মহিলার উপার্জনের ক্ষমতা বা সংগতি না থাকে (Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum AIR 1985 S.C. 948)। সংবিধানের ১৪১ ধারাতে লিপিবদ্ধ আছে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এবং সকলে তা অনুসরণ করতে বাধ্য। মুসলমান সমাজের কিছু ধর্মীয় আর রাজনৈতিক নেতা এই রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁরা বললেন, এমন একটি আইন প্রবর্তন করতে হবে যার ফলে ওই ১২৫ ধারা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। এঁদের প্রধান অভিযোগ হল, এই রায় মুসলমান ধর্ম বা শরিয়তের বিরুদ্ধ। এই সমাজপতিরা বলতে চান, বিবাহবিচ্ছেদের তিন মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ ইদ্দতকালে, স্বামী ভরণপোষণ দিতে বাধ্য—এই হল ইসলামের বিধান। তিন মাস অপেক্ষা করার কারণ, ওই মহিলা সন্তানসম্ভবা কিনা তা নিরূপণ করা। এঁদের দ্বিতীয় আপত্তি, ওই ফৌজদারি আইনের ১২৭ (৩) (খ) ধারার অর্থ হল, স্বামী যদি বিবাহচুক্তিতে নির্ধারিত 'মোহর' বা 'মুদ্রা' (dower) বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্বে বা পরে স্ত্রীকে দেন, তাহলে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীকে কোনো অতিরিক্ত খরচ দিতে হবে না।

শিক্ষিত মুসলমানেরা মনে করেন, মৌলভী-মৌলানার এই অভিযোগ ভুল, এবং তা উদ্দেশ্যমূলক। পবিত্র কোরানে এবং হদিসে যদিও বিবাহবিচ্ছেদ বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুমোদিত, তবু স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নৈতিকতাবিরুদ্ধ। কোরানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে, "স্ত্রীর প্রতি ন্যায়সংগত ও ভদ্র ব্যবহার করবে।" (শুরা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ৪, আয়াত বা চরণ ১৯)। ঐ চরণে একথাও বলা হচ্ছে যে, "তুমি যদি কোনো কারণে ওঁকে পছন্দ না কর, তবু ভুলে যেও না

যে তাঁকেও আল্লা কিছু ভালো গুণ দিয়েছেন।" অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্য হলেও সদয় হওয়া উচিত। হজরত মহম্মদের বাণী ও জীবন পবিত্র হদিসেও আছে, "সমস্ত আইনসংগত বিষয়ের মধ্যে আল্লার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে তালাক—" (আবু-দাউদ ইব্‌নে ওমর দ্বারা উল্লেখিত)। আর-এক অংশে হদিসে লেখা আছে, "বিবাহ করো, তালাক দিও না—কারণ আল্লার সিংহাসন তালাক দিলে কাঁপে" (সাগর)। "বিশেষ অপ্রিয় কারণ ব্যতীত তালাক দেবে না—কারণ আল্লা সেইসব পুরুষ বা রমণীকে ভালোবাসেন না যারা শুধু ভোগ করার জন্য বিবাহ করে" (সাগর)। "যদি বিশেষ কারণে তালাক দিতেই হয়, তবু একজন বে-সরকারি বিচারক বা সালিস, স্বামীর পক্ষে একজন আর স্ত্রীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়ে বিবাদ বা মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে" (কোরান, শুরা ৪, চরণ ৩৫; এবং শুরা ৬৫, চরণ ২)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে এই শ্লোকের ভিত্তিতে আইন করা হয়েছে যে পুনর্বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করবে একটি তিনজনের ট্রাইবুনাল বা আদালত, যাতে স্বামীর ও স্ত্রীর প্রতিনিধি থাকবে এবং সভাপতি হবেন একজন সরকারি কর্মচারী (মুসলিম ফ্যামিলি অ্যাকট VIII, ১৯৬১)। কোরানে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, "সব চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে তালাকের পর স্ত্রীকে সম্মান এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিদায় দাও। যদি অসদ্ব্যবহার কর বা সীমা অতিক্রম কর, তাহলে তুমি তালাকপ্রাপ্ত মহিলার আত্মার প্রতি অবিচার করবে। আল্লার আদেশকে উপহাস বা মিথ্যা অভিনয়ের বিষয় কোরো না—" (কোরান, শুরা ৪, আয়াত ২৩১)। "তালাকের সময় স্ত্রীর প্রতি ন্যায়-সংগত (ভবিষ্যতের জন্য) সুব্যবস্থা করা সৎ লোকের কর্তব্য" (কোরান, শুরা ২, আয়াত ২৪১)। "অনাথ, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক ও নিকট আত্মীয়দের সাহায্য করবে—এটি সৎ কাজ" (কোরান, শুরা ২, আয়াত ১৭৭)। কোরানে বা হদিসের আদেশ বা উপদেশের কোনো জায়গায় অসহায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে খোরাকি বা সাহায্য করার নিষেধবিধি নেই। যা নিষিদ্ধ নয়, তার বিধান হলে বে-আইনি হয় না। তা ছাড়া, তালাকপ্রাপ্ত, অসমর্থ, অসহায় মহিলাকে সাহায্য করা কোরান বা হদিসের মূলনীতির বিরুদ্ধ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ইসলামের বিধান আছে যে, প্রতি মুসলমানকে তাঁর উপার্জনের আড়াই অংশ জাকাত বা দান করতেই হবে। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান তার বেশি অংশ দরিদ্রকে দান করেন, তা কি আইনবিরুদ্ধ হবে? সুতরাং ইদ্দতকালীন তিন মাসের পরেও যদি তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে বলা হয়, তা ধর্মবিরুদ্ধ হবে কেন? বিশেষত সেই মহিলাই এই আশা করতে পারেন, যিনি অসহায়। স্বামী বেশি দিলে পাপ হবে কেন? বরং অসহায়কে সাহায্য করার জন্য পুণ্যই হবে। এইসব যুক্তি সত্ত্বেও, যদি মৌলানা-মৌলভীরা মনে করেন বা কল্পনা করেন যে, অসহায় তালাক-প্রাপ্ত মহিলাকে সাহায্য করা শরিয়ত-বিরুদ্ধ, আর সেজন্য তাঁরা গুণাহ্ বা পাপ করবেন, তাহলে সবচেয়ে উত্তম হবে—যদি তাঁরা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে খোরাকি দিয়ে গুণাহ্‌গার বা অপরাধী হওয়ার বদলে স্ত্রীকে তালাক না দেওয়াটাই শ্রেয় মনে করেন। তাহলে ঐ স্বামী পাপের ভাগীও হবেন না, বরং অসহায় স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য পুণ্যের ভাগী হবেন।

এই যুক্তিতে তালাক দেওয়ার সময় স্বামী যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে ১২৭ (৩) (খ) ধারাও প্রযোজ্য হবে না। এমন তো হতে পারে যে, 'মোহর' তালাকের আগেই স্ত্রীকে দেওয়া হয়ে গেছে। 'মোহর' শুধু তালাকের সময়ই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তা ছাড়া, 'মোহরে'র চুক্তিযুক্ত প্রাপ্য টাকা প্রতি স্বামীকেই দিতে হবে শরিয়তি আইন অনুযায়ী। স্ত্রী বা তালাক-

প্রাপ্ত স্ত্রী দেওয়ানি আদালতে সর্বদাই তা দাবি করতে পারেন। ধনী-দরিদ্র স্ত্রীমাত্রেই সে টাকা পাবেন বিবাহের চুক্তিমতো—বিবাহের পর, তালাকের পর, এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরও—এই হল শরিয়তের আইন।

শাহবানু মোকদ্দমার রায় ধর্মবিরুদ্ধ তো নয়ই, বরং সংবিধানসম্মত। রাষ্ট্রসংঘের মানবতা-অধিকার সংক্রান্ত আইনের অনুগামী। কারণ, পুরুষ-নারী, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য সম্পূর্ণ অবৈধ (Constitution of Juris Articles 13, 14, 15 and Universal Declaration of Human Rights).

একথাও মনে রাখতে হবে যে ফৌজদারি ধারার অপরাধ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রযোজ্য। চুরি, ডাকাতি তো সমাজবিরুদ্ধ। এই অপরাধের জন্য হিন্দু মুসলমান সকলকে শাস্তি পেতে হবে। যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবেন, সেই স্ত্রী যদি হন নিঃস্ব, সে স্বামীও শাস্তি পাবেন, তাঁর সমাজবিরোধী কাজের জন্য।

যদি কোনো মুসলমান স্বামী মনে করেন যে শরিয়ত আইন অনুযায়ী তিন মাসের বেশি খোরাক দিতেও তিনি বাধ্য নন, তিনি দেওয়ানি আদালতে ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা অনুযায়ী ভরণ-পোষণের আদেশ অবৈধ প্রতিপন্ন করার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন।

সংরক্ষণশীল মুসলমানদের আন্দোলনের চাপে নতুন আইন "দ্য মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ডাইভোরস) অ্যাক্ট ১৯৮৬" প্রবর্তিত হয়েছে মুসলমান তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সুখ-সুবিধার উদ্দেশ্যে। ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা অনুযায়ী স্ত্রীরা সহজে ভরণপোষণ পেতে পারতেন, কিন্তু এই আইন অনুযায়ী স্বামীর কোনো দায়িত্ব নেই তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে। ধর্মাদেশ অনুযায়ী বিবাহচুক্তি শেষ হয়ে যায়, এবং সেজন্য তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণের জন্য কোনো সাহায্য করতে স্বামী মহাশয় বাধ্য নন। এই হল তাঁর ধর্ম। ১২৫ ধারা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকলে, মুসলমান স্বামীদের চিন্তা করতে হত—তাঁরা তালাক দেবেন কিনা কারণ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে সারাজীবন ভরণপোষণের খরচ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং তাঁর কারাগারে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। নতুন আইনে স্বামী বিনা কারণে তালাক দিতে পারবেন, অথচ স্ত্রীকে ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে না। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। স্বামী শাস্তি পাবেন না বা তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। নতুন আইন বলবৎ হবার সঙ্গে-সঙ্গে তালাক দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া হবে। বিনা কারণে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবেন, আর স্ত্রীকে জানিয়ে দেবেন বাপমা-ভাইবোন-আত্মীয়ের কাছে চলে যেতে তাঁর ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্য। কোরান এবং হদিসের উপদেশ ধর্মগ্রন্থে লেখাই থাকবে। স্বামী মনের আনন্দে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হবেন। বহুবিবাহ আর তালাকের সংখ্যা বাড়বে। দরিদ্র দেনাগ্রস্ত পিতা-মাতা-ভাইকে বোনের ভরণপোষণ করতে হবে, অসহায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলা অন্য সংসারে দাসীর মতো জীবনধারণ করবেন। আত্মীয়স্বজন নিঃস্ব হলে ভিখারির মতো তাঁকে শহরের ওয়াকফ বোর্ডের অফিসে এসে দরখাস্ত করতে হবে। ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরা হলেন শাসক-রাজনৈতিক দলের লোক। এদিকে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের যা আয় তা ওই বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া ওয়াকফ আইনে ওয়াকফ আয় কেবলমাত্র ওয়াকফ দলিলের নির্দেশ অনুযায়ী খরচ হতে বাধ্য। সুতরাং তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে মাসিক ভাতা দেবার কোনো উপায় নেই। আর সরকার জনসাধারণের টাকা শুধু একাংশ সংখ্যালঘুদের সাহায্যেই বা ব্যয় করবেন কোন্ যুক্তিতে?

পরিশেষে এই নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল? শরিয়ত অ্যাকট, ১৯৩৭, ডিজলিউশন অব মুসলিম ম্যারেজ অ্যাকট, ১৯৩৯ কিংবা ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর অ্যাকট, ১৯৭৪ সামান্য সংশোধন বা পরিবর্তন করলেই তো একই ফল হত। নতুন আইনের অনুবিধি যদি শরিয়তসম্মত হয়, মোল্লা-মৌলভীর ব্যাখ্যায় বা ফতোয়াতে—তার উত্তরে বলা যায়, শরিয়ত আইন তো বলবৎ আছে, এবং এই অনুযায়ী বাপমা-ভাইবোনের কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ গ্রহণের অধিকার তো শরিয়ত আইনেই আছে। সুতরাং এই নতুন আইন দুর্বোধ্য এবং প্রয়োজন-অতিরিক্ত।

পরিশেষে, এই আইন এত দ্রুত প্রবর্তিত হয়েছে যে, উরদুভাষী পত্রিকাগুলিও এখন সমালোচনা আরম্ভ করেছে, অনুতাপ করছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এই আইন জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় এবং নারীমুক্তি বা প্রগতির পরিপন্থী।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দশ

নুরুজ্জামান মৌলাহাট মসজিদে তার পিতার ভূমিকা নিয়েছে কিছুদিন। কারণ বদিউজ্জামান গেছেন তিন ক্রোশ দূরের এক শিষ্য-গ্রাম শিসগাঁয়ে। নবীন মৌলানা নুরুজ্জামান তাই নমাজ-পরিচালক হয়েছে। গত জুম্মাবারের নমাজে তার খোত্‌বা-পাঠে (শাস্ত্রীয় ভাষণ) মৌলাহাটের মুসল্লিদের মধ্যে ধুম পড়ে যায়। শোভান্নালা! কী গলার আওয়াজ! কী উচ্চারণ! একেই বলে, 'বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া। কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।'

ফজরের নমাজ সেরে বাড়ি ফিরে সে তার বালিকাবধূকে তখনও কোরান-পাঠে ব্যাপৃত দেখেছিল। বারান্দায় পাতা জায়নামাজ বা প্রার্থনা-আসনটি একটি রঙিন গালিচা। দেওবন্দমুলুক থেকে কিনে এনেছিল নুরুজ্জামান। এ মুহূর্তে মনে হল, খোদাতালার কী মহিমা! পরিস্তানের এক পরিকে মন দিয়ে অনুভব করছিল নুরুজ্জামান। কিন্তু শালীনতাবশে উঠোন থেকে সে একটু সরে কুয়োতলায় গেল। একটু কাশল। বাড়িটা যেন জনহীন। রোজির কোরান-পাঠের মৃদু ধ্বনিপুঞ্জে সারা বাড়ি পবিত্রতার মধ্যে বুঁদ হয়ে আছে। তার কাশির শব্দটুকু কোনো পৃথক স্পন্দন তুলল না। তিনটি মাটির ঘরের একটি দলিজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানেই বালিকাবধূ নিয়ে রাত্রিযাপন করে নুরুজ্জামান। মাঝের ঘরটিতে থাকে মনিরুজ্জামান আর তার বালিকাবধূ। শেষ ঘরটিতে দাদিআম্মা কামরুন্নিসা আর মা সাইদা বেগম। বাড়িতেও রোদ আসে নি। ধূসর আলোর ভেতর দরজাখোলা তিনটি ঘরের ভেতর ঘন কালো ছায়া থমথম করছে। তবু নুরুজ্জামান দেখতে গেল, সাইদা তাঁর শাশুড়ির একাঙ্গ ডলে দিচ্ছেন। মাঝের ঘরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এক মুহূর্তের জন্য নুরুজ্জামানের মাথায় এল, তার ভ্রাতৃবধূ আজও সম্ভবত কোরানপাঠ করে নি। কিছুদিন থেকে

এ ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তার। রোজ দুই বোন পাশাপাশি বসে ভোরবেলায় কোরানপাঠ করত। হঠাৎ এমন ঘটছে কেন? রোজিকে জিগ্যেস করবে, দুইবোনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নাকি।

সেই মুহূর্তে মাঝের ঘর থেকে এলোমেলো কাপড়, গোঁপাভাঙা চুল, বেরিয়ে এল রুকু। এসেই ভাসুর-সায়েবকে দেখে থমকে গেল। তারপর আবার ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতর থেকে এইসময় গোঙানির মতো ভুতুড়ে হাসির শব্দ ভেসে এল। নুরুজ্জামান বিকৃতমুখে গলার ভেতর বলল, জানোয়ার!

রোজির কোরানপাঠ শেষ। কোরান বন্ধ করে সে সেই পবিত্র ঐশীগ্রন্থটিকে চুম্বন করে কপালে ঠেকাল। তারপর নকশাদার লাল রেশমি কাপড়ের আধারে ঢুকিয়ে শেষপ্রান্তের সরু চিকন দড়িটি দিয়ে জড়াল। রেহেল বা কাঠের পুস্তকাধারটিও ভাঁজ করে নিয়ে বারান্দার তাকে রাখল। গালিচাটি গুটিয়ে ঘরে নিয়ে যাবার সময় সে ঘুরে দেখতে পেল, তার স্বামী তাকে অনুসরণ করছে। একটু হাসল রোজি। তারপর নিজের ঘরে ঢুকল।

নুরুজ্জামান ঘরে ঢুকেই তক্তাপোশের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। সে হাসছিল না। রোজি গালিচাটি রেখে তার পাশে এসে বসে পড়ল এবং বুকের ওপর ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল, আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন গো?

নুরুজ্জামান আস্তে বলল, কিছু না।

আপনি আমার উপর গোঁসা করেছেন?

এবার নুরুজ্জামান একটু হাসল। তোমার ওপর গোঁসা করার হিম্মত কার? এইসা নেক আউরত তুম!

রোজি তার তরুণ স্বামীর দাড়িসুদ্ধু চিবুক ধরে বলল, আবার ওই খোট্টাপনা? ওসব করবেন মসজিদে গিয়ে। আমার কাছে নয়।

নুরুজ্জামান হাসল। মুসলমানের জবান, রোজি।

রোজি কপট অভিমান দেখিয়ে বলল, তো যে-মুলুকে ছিলেন, সেই মুলুক থেকে কাউকে শাদি করে আনলেই পারতেন।

নুরুজ্জামান রোজিকে বুকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে রোজি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ভ্রু কুঞ্চিত। যেন বলতে চায়, দরজা খোলা। কেউ এসে পড়লেই কেলেংকারি হবে না বুঝি?

নুরুজ্জামান একটু চুপ করে থাকার পর বলল, একটা বাত পুছ করব, রোজি!

কী?

বহিনের সাথ কি তোমার কাজিয়া হয়েছে?

মুহূর্তে রোজি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। স্বামীর শাদা কোর্তার বোতাম খুঁটতে-খুঁটতে মাথাটা শুধু নাড়ল।

নুরুজ্জামান বলল, তোমরা একসাথ কোরান তেলাওয়াত (পাঠ) করছ না! আলগ-আলগ থাকছ। রোজি দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, রুকুকে আটকে রাখে।

নুরুজ্জামান দ্রুত উঠে বসল। বলল, কে? ওই কমবখত্ শয়তানটা?

চুপ।···বলে রোজি উঠে দাঁড়াল। কই সরুন, বিছানা গুছোই। সুজনিটা ময়লা হয়েছে। কাচতে হবে।

নুরুজ্জামানের টুপিটা বালিশে পড়ে গিয়েছিল। সে সেটি তুলে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তব্ধভাবে বলল, এইসা নাহি চলে গা। আমি এসব বরদাস্ত করব না।

রোজি ধমকের ভঙ্গিতে বলল, আপনি আসুন তো। কেলেংকারি যা হবার হচ্ছে, আর বাড়াবেন না।

নুরুজ্জামান অবাক হল।···কী হচ্ছে?

রোজি জবাব দিল না। সুজনি গোটাতে ব্যস্ত হল। বাইরে সাইদার গলা শোনা গেল, বড়ো বউ-বিবি! একবার আসবে, মা?

রোজি সুজনি নিয়ে বেরিয়ে গেল শাশুড়ির ডাকে। সাইদা বললেন, আমার হাতে মালিশের

তেল। সাজিমাটি দিয়ে না ধুলে যাবে না। ততক্ষণ তুমি নাশতার জন্য আটা মাখো। বিবিজি আজ পরোটা-হালুয়া খেতে চেয়েছেন। বয়োমে ঘি আছে দেখো গে।

সাইদা কুয়োতলায় গেলেন। রোজি সুজনিটা বারান্দায় রেখে ডাকল, রুকু!

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, যাই!

একটু পরে সে বেরুল। রোজি বলল, আয়, নাশতা বানাতে হবে।

দুজনে রান্নাঘরের বারান্দায় গেছে, এমন সময় নড়বড় করে চৌকাঠ ধরে বেরিয়ে এল মনিরুজ্জামান। সে এখন কোনোরকমে টলতে-টলতে হাঁটতে পারে। গত জুম্মায় বড়োভাই নুরুজ্জামান তাকে মসজিদে নিয়ে গিয়েছিল। দেওবন্দ থেকে ফিরে মনিরুজ্জামান-কে মুসল্লি বানানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছে নুরুজ্জামান। নমাজ, দোওয়াদরুদ আবৃত্তি করা শেখাচ্ছে। জড়ানো গলায় অনেক কষ্টে দু-চারটি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে সে, অনবরত লালা গড়ায় যার মুখে, তাকে ঐশীবাণী আবৃত্তি শেখানো সহজ নয়, নুরুজ্জামান বুঝতে পারে। তবু এইটুকু উন্নতি দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। পিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময় জিনেদের গোপন সম্পর্ক এখন তার বিশ্বাস্য মনে হয়।

মনিরুজ্জামানের পরনে ডোরাকাটা তহ্বন্দ। খালি গা। সে বারান্দায় পা বাড়ালে কুয়োতলা থেকে সাইদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, অই! অই! অ মেজো-বউবিবি, ছাখো, ছাখো কোথা যাচ্ছে!

মনিরুজ্জামান গোঙানো গলায় উচ্চারণ করল, মুঁ খোঁ-খোঁ—

মুখ ধুবি তো ওখানেই বস। সাইদা ধমক দিলেন। বস ওখানে। পানি দিচ্ছি।

মনিরুজ্জামান গ্রাহ্য করল না। বেপরোয়া ভঙ্গিতে বারান্দার বাঁশের খুঁটি ধরে সিঁড়িতে পা রাখল। তারপর টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নীচে পড়ল।

সাইদা আর্তনাদ করে দৌড়ে এলেন। নিজের ঘর থেকে নুরুজ্জামান একবার উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখল শুধু।

সাইদা ধরতে গেলে মনিরুজ্জামান একটা চাপা হুংকার দিল। বোঝা গেল, সে এই দুনিয়ায় পা ফেলে হাঁটার জন্য অন্যের ভরসা করতে রাজি নয়। মায়ের হাতটা সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। তারপর হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে দাঁড়াল। নড়বড় করে পা ফেলে কুয়োতলার দিকে এগোতে থাকল।

রান্নাঘরের বারান্দায় আটা মাখতে মাখতে দৃশ্যটা রোজি দেখছিল। মুখ টিপে হাসছিল। আর রুকু উঠোনের দিকে পিঠ করে বসেছে পিঁড়িতে। উনুনে ঘুঁটে সাজাচ্ছে। একবারও ঘুরল না এদিকে। তার মুখে নির্লিপ্ততার গাঢ় ছাপ। রোজি ফিসফিস করে বলে উঠল, তোর দামাঁদ (বর) খেপল কেন রে? তখন কানে আসছিল, দুজনে খুব যুদ্ধ করছিলি যেন!

রুকু বলল, বেশ করছিলাম। তোর তাতে কী?

রোজি হাসল। তারপর ঠোঁট উলটে বলল, আমার আবার কী? কানে এল, তাই বলছি।

রুকু শলাইকাঠি জ্বেলে একগোছা খড়ের নুড়ি ঢোকাচ্ছিল উনুনের ভেতর সাজানো ঘুঁটের স্তূপে। বলল, চিরকাল আড়িপাতা তোর স্বভাব।

রোজি চাপা হাসতে লাগল। আব্বাসায়েব ফিরে এলে বলিস, কালো জিনটা এখনও পালায় নি তোর দামাঁদের কাছ থেকে।

রুকু ঝাঁঝালো স্বরে বলল, ভালো হবে না বলছি, রোজি!

বেশ বাবা, বেশ। তোমার দায় তুমি সামলাও। আমার কী? বলে রোজি পরোটা বেলতে থাকল। দুলতে-দুলতে কাজ করা তোর স্বভাব।

সাইদা প্রতিবন্ধী পুত্রের সঙ্গ ছাড়েন নি। কুয়ো-তলায় তাকে আগের মতো মুখ ধুইয়ে না দিলেও পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তবে তিনি মনে-মনে এখন ভারি খুশি। খোঁড়া পিরের দরগায় গোপন

মানত অথবা কোবরেজমশাইয়ের ওষুধের গুণেই হোক, এতকাল পরে মনি যে হাঁটতে বা কথা বলতে পারছে, এ এক বিস্ময় তাঁর। তবে এজন্য তিনি দরিয়াবানুর কাছে ঋণীও বটে। কতবার করে বলেন, তোমার গুণ কী দিয়ে শুধব বেয়ান? রোজ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে খোদাতালাকে বলব, আমি যেটুকু নেকি (পুণ্য) করেছি, তার আদ্ধেক আমার বেয়ানকে দিচ্ছি! দরিয়াবানু বলে, ওকথা বলতে নেই বেয়ান! আমি মুরুক্ষু চাষার বেটি। বরাতজোরে মিয়াঁর ঘর করতে এসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, এটুকুন জানি—কিসে কী হয়। যদি ছোটোবেলা থেকে ছেলেটাকে হাঁটাচলা শেখাতে, চেষ্টাচরিত্তির করতে—বাছার এমন দশা হত না!

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বিয়ের পরই যেন রাতা-রাতি বদলে গেছে মনিরুজ্জামান। লালা গড়ালে মুছতে পারে। হাতদুখানির নুলো দশা কিছুটা ঘুচে গেছে মালিশের গুণে। নিজের হাতেই খেতে চেষ্টা করে। যেন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তার আত্মার ভেতর কী এক উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছে।

কিন্তু সেই উদ্দীপনাই যেন তাকে ইদানীং কেমন হিংস্র করে ফেলেছে। মুখে হাত ঢুকিয়ে উনিশ বছরের এই ন্যালা ছেলেটি আর খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হাসে না। পাখ-পাখালি দেখে আগের মতো অবাধ খুশিতে তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। বরং হুংকার দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। গাইগোরুটির দুধ দুইয়ে দিত আয়মনি। তার হঠাৎ কী হয়েছে, পিরসাহেবের বাড়ির আনাচে-কানাচেও তাকে দেখা যায় না। আয়মনি দুধ দুইয়ে বিবিসাহেবাকে দুধভরা পেতলের পাত্রটি দিতে এলে বারান্দা থেকে মনি দুহাত নড়বড়িয়ে শিশুর মতো ছটফট করত। গোঙানো স্বরে দুধ খাওয়ার জন্য কিছু বলার চেষ্টা করত। আর আয়মনি তাকে সস্নেহে বলত, সবুর বাপজান! একটুখানি সবুর! কাঁচা দুধ খেয়ে ছ্যারানি হবে জান না? কী যে হাসত আয়মনি এইসব কথা বলতে-বলতে! আর মনির মুখ থেকে লালা গড়াত। সে দুপাশে দুলত। হাত দুটো সামনে নাড়া দিত। পাছা ঘসটাতে-ঘসটাতে কখনও রান্নাঘরের দিকে এগোনোর তালে থাকত। আয়মনি বলত, অই! অই! সাহস দেখছ ছেলের?

এখন দুধ দুইতে আসে দুলির মা নুরি। হাঁটুর নিচু অব্দি ডোরাকাটা তাঁতের খেরোপরা দুলির বুকে আয়মনির ভাষায় 'কুসুমফুল ফুটেছে।' তবু খালি গা ওই মেয়ের। শাড়ি পরালে নাকি ঝটপট 'কুসুম-ফুল' ডাগর হয়ে যাবে! নুরি দুধদোহায়। তার মেয়ে বাছুরটার দুই কান ধরে আটকে রাখে। বাছুরটা তার পেটে ঢুঁ মারে। পরশু এক কাণ্ড ঘটেছিল।

বাছুরের ঢুঁতে দুলির খেরো খুলে সে এক লজ্জা-লজ্জি ব্যাপার। রোজি দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার আব্রু রক্ষা করেছিল। কিন্তু বারান্দায় বসে অভ্যাসে হাত চুষতে গিয়েই মনির যেই চোখে পড়ে, সে প্রচণ্ড এক হুংকার ছেড়েছিল। বাড়িতে সেই সময় যারা ছিল, প্রত্যেকে টের পেয়েছিল এ কিসের হুংকার। মনিরুজ্জামান মানুষে পরিণত হচ্ছে। মেয়েদের আব্রু বুঝতে পেরেছে সে।

ফেনিল দুধের পাত্রটি সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখলে এখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে বটে, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে। অপেক্ষা করে কখন মা তার জন্য গেলাসে করে দুধ আনবেন। চামচে করে ফুঁ দিয়ে খাওয়াবেন।

এদিন সে আরও আশ্চর্য এক কাণ্ড করল।

শাশুড়িকেও কাছে বসে খাওয়াতে হয়। পক্ষা-ঘাতের রুগি কামরুন্নিসা নিজের জীবিত একটি হাত দিয়ে খেতে পারেন, তবে গিলতে কষ্ট হয়। সাইদা তদারক করেন। তারপর খাওয়াতে যান মনিকে।

আজ মনি একটা হাত নেড়ে মাকে বুঝিয়ে দিল, তাঁর হাতে খাবে না। সাইদা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, নে! তোর আজ আবার কী হল?

মনি গোঙানো স্বরে কিছু বলল।

বুঝতে না পেরে সাইদা রেগে গেলেন। আর কত জ্বালাবি তোরা আমাকে? তোদের জন্য আমার হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। এবার গোরে গিয়ে ঢুকি, তবে তোদের শান্তি হয়—তাই না?

রোজি তার স্বামীকে নাশতা দিতে গিয়েছিল। সাইদার চড়া গলা শুনে বেরিয়ে এল। রুকু রান্নাঘরের বারান্দার উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, শুধু আগুন দেখছে।

সাইদা ছেলের সামনে নাশতার থালা রেখে রান্না-ঘরে গেলেন। রোজি দেখল, মনি চোখ বড়ো করে তাকিয়ে আছে—হ্যাঁ, রুকুরই দিকে। রোজি ঠোঁটের কোনায় হেসে এগিয়ে এল দেওরের কাছে। চাপা স্বরে বলল, কী মিয়াঁ? আজ বুঝি বিবির হাতে খানা খাওয়ার ধান্দা?

মনি গ্রাহ্য করল না তাকে। তখন রোজি আলতো পায়ে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় গেল। শাশুড়ি গম্ভীর মুখে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছেন। রোজি পা বাড়িয়ে রুকুর পেছনটা ছুঁল। রুকু ঘুরে ওকে একবার দেখে নিয়ে বলল, কী?

সাইদা দুজনের দিকে তাকালে রোজি ঝটপট বলল, রুকুকে ডাকছেন মেজোমিয়াঁ।

সাইদা একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বললেন, সে আমি কী বলব মা? তোমাদের ইচ্ছে। কেউ যদি ওর খিদমত (সেবা) করে, আমি তো বেঁচে যাই। এখন যা ভালো বোঝ, করো।

রুকু পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। সাইদা শাশুড়ির ঘরে গিয়ে ঢুকলে রোজি ধমক দিল বোনকে।...ইশ! শরমে গলে হালুয়া! নিজের দামাঁদকে খাওয়াবে, তাতে শরম। কেন, আমি খাওয়াই না বড়োমিয়াঁকে?

রুকু কোনো জবাব দিল না। আঁচল বাড়িয়ে দুধের পাত্রটা উনুন থেকে নামাল। তারপর উঠোনে নেমে হনহন করে খিড়কির ঘাটের দিকে চলে গেল। রোজি শুধু বলল, দেখছ?

মনির নিষ্পলক চোখদুটো অনুসরণ করছিল রুকুকে। খিড়কি খুলে রুকু ঘাটে নামতেই চাপা হুংকার দিয়ে সে নাশতার থালাটায় লাথি মারল।

সাইদা দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। নীচের উঠোনে হালুয়া-পরোটা ছড়িয়ে পড়েছে। থালাটা উলটে গেছে। সাইদা জীবনে যা করেন নি, করবেন বলে কল্পনাও করেন নি, আজ তাই করে বসলেন। তাঁর পায়ে কালো চটিজুতো। একপাটি খুলে মেজোছেলের মাথায় মারতে শুরু করলেন।...জানোয়ার! শয়তান! আজ তোমার জানসুদ্ধ খতম করে দেব! মুখের রুজি তুমি ছুড়ে ফেলতে পারলে?

সাইদার সারা জীবনের জমানো রাগ ফেটে পড়-ছিল বুঝি। কামরুন্নিসা চেঁচামেচি করে জানতে চাইছিলেন, কী হয়েছে? অ বউবিবি? হয়েছে কী? অ রোজি! অ রুকু!

মনি মায়ের চটিটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। পারছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় খুঁটি আঁকড়ে ধরে রোজি থ। তারপর মনি মায়ের কাপড় খামচে ধরল। গলায় বিকট গোঙানির আওয়াজ। নুরুজ্জামান এঁটো হাতে বেরিয়ে একমুহূর্তে দৃশ্যটা দেখল। সে চেঁচিয়ে উঠল, আম্মাজান! ইয়ে ক্যা হো রাহা?

সে দৌড়ে এসে মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর ভাইয়ের হিংস্র হাত থেকে মায়ের কাপড় মুক্ত করে বলল, তওবা! তওবা! এসব কী শুরু করেছেন আপনারা? ইজ্জত বরবাদ করে দিচ্ছেন! এ কি পির-মওলানা আশরাফ-মোখাদেমের বাড়ি, না চাষা-বাড়ি? ছুঃ ছুঃ!

নুরি তার মেয়েকে নিয়ে একটু আগে চলে গেছে। বাড়িতে এ মুহূর্তে বাইরের লোক নেই। নুরু ভাইয়ের হাত ধরে ওঠানোর চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ আগে যাকে সে জানোয়ার বলে গাল দিয়েছে, এখন তার জন্য দরদ জেগেছে মনে। কিন্তু মনি তার হাতে কামড় দিতে গেলে সে ঝটপট হাত সরিয়ে নিল। ফের

খ্যাপ্পা হয়ে বলল, অ্যাই বুড়বক আকেলমন্দ্ বেতমিজ? কী হয়েছে তোর? উল্লুকা মাফিক কাম করছিস কেন? বেশরম খবিস কাঁহেকা!

সাইদা কাঁদতে-কাঁদতে শাশুড়ির কাছে ফিরে গেলেন। রোজি এতক্ষণে উঠোনে নেমে হালুয়া-পরোটা থালায় তুলে নিল। অনেকদিন বৃষ্টি হয় নি। উঠোনে ধুলো জমেছে। নাশতাটা তাই সাবধানেই তুলেছিল সে। এ বাড়ির শিক্ষা, মুখের রুজি নষ্ট করতে নেই। নিজে খেতে না পার, তো ফকির-মিশকিন লোককে দান করে দাও। নেকি হবে।

রোজি সেই কথা ভেবেই থালাটা রান্নাঘরে নিয়ে গেল। মুরু ফিরে গিয়ে অবশিষ্ট নাশতায় মন দিল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না সে। রোজির প্রতীক্ষা করতে-করতে পরোটার শেষ টুকরোটা চিবুতে থাকল সে।···

ঘাটের মাথায় খিড়কির দরজার পাশেই কলা-গাছগুলো বেশ ঝাঁক বেঁধে উঠেছে। রুকু সেখানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা দেখেছে। হঠাৎ তার ইচ্ছে করেছিল, ছুটে গিয়ে ওই জন্তুমানুষটাকে বাঁচায়। কিন্তু ওকে পালটা আক্রমণ করতে দেখেই থমকে গেছে। মরুক! মেরে ফেলুক ওকে বিবিজি! রুকু মনে-মনে বলছিল।

তারপর সব শান্ত হয়ে গেছে। বাড়িটা চুপ। রুকু ব্যাপারটা দেখেছে, অন্তত রোজি যেন জানতে না পারে—এই ভেবে সে কলাগাছের আড়ালে সরে এল।

কিন্তু বাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না তার। যদি পারত, পালিয়ে যেত কোথাও। অন্তত একটা দিনের জন্যও যদি বাইরে কাটাতে পারত। মায়ের কাছে গেলে তো বকুনি আর পিটুনি দুই-ই খাবে। বাবাকে দুই বোনে শুধু দূর থেকে জানত। মা-ই তাদের সব। এতদিন মা তাদের শিয়রে ছিল। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দিয়েছে। সেই স্বাধীনতা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে তাদের দরদিনী মাও কেমন হিংস্র হয়ে উঠল—কেন এমন হল, রুকু আজও বুঝতে পারে না। বারিচাচাজির সঙ্গে ঝগড়াই কি এর কারণ? আরও অবাক লাগে, বারিচাচাজি আসাই ছেড়ে দিলেন মৌলাহাটে!

আর আয়মনিখালা! তারও কী হল, এবাড়ি আর আসে না। বিবিজি কি কিছু মন্দ কথা বলেছেন ওকে? রুকু খুঁজে পায় না। কলাগাছের পাশে দাঁড়িয়ে রুকুর ইচ্ছে করছিল, বুক ফেটে কাঁদে। কিন্তু কান্নাতেও আজকাল কী এক ভয়। সবকিছুতে ভয়। দুনিয়াসুদ্ধ পর হয়ে গেলে যে ভয় মানুষকে পেয়ে বসে, সেই ভয়—কিংবা অন্য কোনো ভয়। সে পুকুরের ওপারে জঙ্গলের ভেতর খোঁড়াপিরের মাজারের বট-গাছটির দিকে তাকাল। মনে-মনে মাথা কুটল, পিরবাবা! আমাকে বাঁচাও। নইলে আমি হয়তো মরে যাব।

কখন রোজি নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, রুকু টের পায় নি। আস্তে একটি ডাক শুনে ভীষণ চমকে উঠল।

রোজির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। চোখ বড়ো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে! কেন, নিজের দামাঁদকে খাওয়াতে অত শরম কিসের রে? খামোকা ওকে মার খাওয়ালি। গাঁসুদ্ধ রটতে দেরি হবে না জানিস? আর মায়ের কানে গেলেই হয়েছে। কী হবে বুঝতে পারছিস?

রুকু আর সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রোজি চাপা গলায় ধমক দিল, চুপ! চুপ মুখ-পুড়ী! বাইরে এসে কাঁদতে শরম হয় না? কাঁদবি তো ঘরে ঢুকে কাঁদ গে না!

মুরির গলা শোনা গেল বাড়ির ভেতর। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছে। এবার থালা-হাঁড়িকুড়ি মাজতে আসবে ঘাটে। রোজি বোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল, চুপ! চুপ! মুরিখালা এসেছে! কেলেংকারি হয়ে যাবে।

রুকু ঝটপট ঘাটে গিয়ে নামল। হেমন্তের শুরুতে

পুকুরটা এখনও জলে ভরা। ঘন দাম জমে আছে। ঘাটের সামনেটা শুধু পরিষ্কার। রুকু মুখ হাত পা রগড়ে ধুল। এ বাড়ি খালিপায়ে থাকার রীতি নেই। তার ওপর পিরমওলানা বাড়ির বউবিবি! রুকু খালি পায়ে এসেছিল। চটিজোড়া রান্নাঘরের বারান্দায়, নাকি ঘরে খুলে এসেছে, মনে পড়ল না।

সে উঠে দাঁড়ালে রোজি চাপা স্বরে বলল, মেজো-মিয়াঁ খায় নি। চল্, আমি ফের নাশতা বেড়ে দিচ্ছি। তুই নিয়ে যাবি।

রুকু গলার ভেতর বলল, কচি বাচ্চা নাকি? আর-সবে তো—

চুপ! রোজি বোনকে ধমক দিল। যা বলছি, করবি। নইলে মাকে সব বলে পাঠাব।

সে রুকুকে যেন অদৃশ্য হাতে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে একটা থালায় ছুটো পরোটা আর সুজির হালুয়া তুলে দিল রুকুর হাতে। বলল, তুই যা। আমি পানির গেলাস নিয়ে যাচ্ছি।

একটু ঠেলে দিলে রুকু পা বাড়াল। কামরুন্নিসা আর সাইদা চুপিচুপি কথা বলেছিলেন। নাকঝাড়ার ফোঁসফোঁস শব্দ ভেসে আসছিল। মুরিকে বাসি হাঁড়ি-বাসনকোসন এগিয়ে দিতে থাকল রোজি। একটা চোখ রুকুর দিকে। মেজোমিয়াঁ একটু আগে নিজের ঘরে ঢুকে গেছে! রুকু ঘরে ঢুকলে রোজি মাটির কলসি থেকে কাচের গেলাসে জল ঢালতে ব্যস্ত হল।

গেলাসটা নিয়ে রোজি মুখ টিপে হেসে সোজা চলে গেল মেজোমিয়ার ঘরে। গিয়ে দেখল, বিছানায় বসে পা ছুটো স্বাভাবিক মানুষের মতো ঝুলিয়ে একটু-একটু দোলাচ্ছে মনিরুজ্জামান। কিন্তু মুখটা নীচু। চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। লালার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর তার সামনে মাথায় ঘোমটা টেনে নাশতার থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে রুকু।

স্থালা তরুণটিকে এভাবে কাঁদতে কখনও দেখে নি রোজি। মুহূর্তে তার মন নরম হয়ে গেল। আস্তে বলল, ছিঃ! কাঁদে না! আম্মা মেরেছেন, না অন্য কেউ? খান দিকি, নাশতা খান। দুনিয়ায় কার আম্মা কাকে মারেন না? এই যে আপনার শাশুড়ি—আমাদের মা—আমাদের দুবোনকে কম মারধর করেছেন?

রুকু অবাক হচ্ছিল। রোজির কণ্ঠস্বরে বুড়ি মেয়ে-মানুষের হাবভাব! তারপর রোজি তাকে ঠেলে দিল। বলল যাঃ! হাতে নাশতা তুলে দে না!

তাই করতে গেলে মনি হাত নাড়ল। বুঝিয়ে দিল, খাবে না। তখন রোজি তার পাশে বসে পড়ল। কাঁধে হাত রেখে বলল, লক্ষ্মি ভাইজান! আমি তোমার ভাবি হই। শুনবে না ভাবির কথা? তারপর হেসে উঠল সে।···এই মেয়েটাকে তুমি এখন চিনতে পার নি? বড্ড বদমাইশ মেয়ে। বুঝলে?

আর মনি তাদের দুজনকেই অবাক করে গোঙানো কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, টোঁ-টোঁ-টোঁমড়া কেঁয়ৈছ?

রোজি হাসতে লাগল।···কথা শোনো মিয়াঁর! তুমি না খেলে আমরা খাব? গোনা হবে জান না? কত্তো বেলা হয়ে গেল! খিদে পায় নি বুঝি আমাদের? নাও—খাও! ও রুকু, পরোটা ছিঁড়ে টুকরো করে দে তোর দামাঁদমিয়াঁকে।

মনি গোঁ ধরে বলল, টুঁ-টুঁমি ডাঁও!

তার মানে রুকুর ওপর তার রাগ এখনও পড়ে নি। ভাবি তাকে খাইয়ে না দিলে সে খাবে না। রোজি হাসতে-হাসতে পরোটা টুকরো করতে থাকল।···

এদিন থেকেই তেরো বছরের বালিকাবধূ রোজি এ সংসারে সাইদা বেগমের ঠাঁইটি দখল করে ফেলল যেন। শাশুড়ি আর দাদিশাশুড়িরও সেবাযত্ন তদারক সারাক্ষণ, কোমরে আঁচল জড়িয়ে ব্যস্তসন্তীর হয়ে ছুটোছুটি, মুরিকে কথায়-কথায় ধমক, কত কিছু। আর রুকু আরও উদাসীন নির্লিপ্ত। দুই যমজ বোনের মাঝখানে একটি অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। প্রায়ই শিষ্যবাড়ি থেকে ধানচাল, বিবিধ খন্দ, গুড়ের হাঁড়ি এসে পৌঁছয়। কত দূর-দূরান্তর থেকে শিষ্যরা গোরুর

গাড়ি বা টাট্টুঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, নয়তো নিজেরাই বয়ে আনে হরেক গুরুপ্রণামী। সাইদার মতো আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে নেপথ্যের কণ্ঠস্বরে রোজি নির্দেশ দেয়, কোথায় জিনিসগুলো রাখতে হবে। নুরুজ্জামান বাড়িতে থাকলেও এই খবরদারি রোজির। রুকু লক্ষ করে, রোজির মধ্যে তার মায়ের আদল ফুটে বেরুচ্ছে। প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা তাকে খুব ভেতর থেকে তাতিয়ে দেয়। ভাবে, সে যদি 'জন্তুমানুষ'টার বউ না হত, তাহলে সংসারে কর্তৃত্বের ন্যায্য শরিকানাটি দখল করতে সেও হয়তো কোমরে আঁচলখানি জড়াত। কিন্তু কী দরকার অত ঝামেলায় নাক গলিয়ে? বেশ তো আছে।

না—সত্যিই সে ভালো নেই। যখন-তখন একটা জন্তুমানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমন-কি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়—পালাতেই থাকে, দূরে—বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছেই বা তার এ মানসিক সফর? খালি মনে হয়, পোঁড়াপিরের দরগার ভাঙা ফটকে কাঠমল্লিকার ফুলবতী গাছের কাছে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ভয় পেয়ে পিছু হটে ফিরে আসে নিজের বেইজ্জত শরীরের ভেতর। ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা! নিজের ওপর, সবকিছুর ওপর।···

অনেকদিন পরে আয়মনি এল খিড়কির দরজা দিয়ে। রোজি কুয়োতলার পাশে বিকেলের রোদে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। রুকু বারান্দায় সুজনি সেলাই করছিল। কদিন থেকে ওই নিয়ে লেগে আছে। কদিন থেকে কামরুন্নিসার বুকে ব্যথা-ব্যথা ভাব। তেল দিয়ে বুক ডলে দিচ্ছেন সাইদা। রোজি আয়মনিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, সাপের পা দেখেছ, নাকি দিনে তারা দেখেছ আয়মনিখালা? যাও, যাও। অবেলায় আমরা মেহমান নিই নে।

আয়মনি একটু হাসল।···আসা হয় না মা! বাপজানের শরীল ভালো না। বলে সে রুকুর দিকে ঘুরল। রুকু, কেমন আছ মা?

রুকু আয়মনিকে বলল, ভালো। সে আয়মনিকে দেখছিল। কেমন যেন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে ওকে। সেই সাজগোজের ঘটা আর নেই। কপালে টিকলি নেই, কোমরে রুপোর চন্দ্রহার নেই, পায়ে নেই রুপোর মল। কানের সোনার বেলকুঁড়িটা নেই।

রোজির কাছেই দাঁড়িয়ে রইল আয়মনি। এইতেও রুকুর খারাপ লাগল। ওকে দেখেই বুকের ভেতরটা দুলে উঠেছিল চাপা আবেগে। কত কথা জমে আছে মনে!

রোজি হাসতে-হাসতে ছড়া কেটে বলল, 'এসো কুটুম বসো খাটে। পা ধোওগে ডোবার ঘাটে।'

আয়মনি একটু হাসল। আমি কি কুটুম? পর বই তো লই।

রোজি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তাহলে পরের বাড়ি এলে যে বড়ো?

এলাম একটুকুন কাজে।

আয়মনির কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিল, রোজি আর রুকু একই সঙ্গে তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। তারপর রোজি আস্তে বলল, কী কাজ আয়মনিখালা?

আয়মনি বলল, দরিবুবু পাঠাল। সনজেবেলা দুই বহিন একবার যেও।

দরিয়াবানু বেয়ানবাড়ি কদাচিৎ এসেছে মেয়েদের বিয়ের পর এ অঞ্চলের প্রথা হল, বিনা আমন্ত্রণে আর অন্তত বেয়ানরা পরস্পরের বাড়ি যাবে না। সাইদা সেই একবার মৌলাহাটে প্রথম পৌঁছে গাড়ির ধুরি-ভাঙার দুর্ঘটনার দরুন দরিয়াবানুর বাড়ি উঠেছিলেন। ছিলেনও কয়েকটা দিন। কিন্তু তখন তিনি ভাবতেও পারেন নি, এই চাষাড়ে স্বভাবের স্ত্রীলোকটি তাঁর বেয়ান হবে। ছেলেদের বিয়ের সময়ও তিনি যান নি, যদিও বরপক্ষের সঙ্গে বাড়িতে মেয়েদেরও যাওয়ার নিয়ম। আসলে ওই বিয়েটা ছিল একটা হঠকারিতা। একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র।

তবু যে দরিয়াবানু বেয়ানবাড়ি গায়ে চাদরমুড়ি

দিয়ে কখনও এসেছে, সেটা তার পক্ষেই সম্ভব। এসে ঈষৎ লজ্জা আর কুণ্ঠায় বলেছে, এখন আমি পির-সাহেবের বেয়ান। আগের মতো মাঠেঘাটে চাষবাসের তদারকে বেরুতে শরম হয়, বহিন! বেয়াইসাহেবের কানে উঠলে উনিও শরমেন্দা হবেন। অথচ দেখো, বড্ড ক্ষেতিও হচ্ছে। মুনিশ-মাহিন্দার লুটেপুটে খাচ্ছে। সমিস্যেয় পড়েছি।

আরও কিছু সমস্যা ছিল তার স্বামীর স্থানীয় আত্মীয়দের নিয়ে। জমিজমার শরিকানা নিয়ে ঝুটঝামেলা বাধাত। মৌলানা এবং 'পির' বদিউজ্জামান কুটুম্ব হওয়ায় গ্রামের লোক এখন দরিয়াবানুর দলে। তাই সেসব ঝামেলা বাইরে-বাইরে দেখা যায় না। এবার দরিয়াবানু তদারকের জন্য নিজে মাঠে যেতে পারে না বলে চৌধুরি আর খোনকার সায়েবরা যেন আড়াল থেকে মুনিশমাহিন্দারকে প্ররোচনা দিচ্ছেন। ঠিকমতো নিড়ান দেওয়া হয় না। সেচ পড়ে না। এবার ধানের ফলন নিয়ে দরিয়াবানু ভাবনায় পড়ে গেছে।···

আয়মনির কথা শুনে রোজি বলল, তুমি বিবিজিকে বলে যাও আয়মনিখালা! উনি না বললে যাব কেমন করে? আর শোনো, তুমি এসে নিয়ে যাবে—তবে যাব বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

আয়মনি একটু হেসে সাইদাবেগমের ঘরে গেল। সাইদা তাকে দেখে বললেন, কী আয়মনি! এ বাড়ি আসা যে ছেড়েই দিয়েছ?

আয়মনি সে-কথা কানে করল না। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানিয়ে বলল, দরিবুবু রোজি-রুকুকে সনজেবেলা একবার ডেকেছে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব—তাই বলতে এলাম বিবিজি!

সাইদা একটু হাসলেন। বেশ তো, যাবে! বলে শাশুড়ির বুক ডলে দেওয়ার কাজটা থামিয়ে মুখ তুললেন।···নুরু বলছিল, সকালে তাকেও ডেকেছিল বেয়ান। কীসব ঝামেলা হচ্ছে ভুঁইখেত নিয়ে। তো নুরু বলল, ভুঁইখেতের আমি কী বুঝি? তবে শাশুড়ি বলছেন যখন, তখন বরঞ্চ—

আয়মনি কথার ওপর বলল, হুঁ—তাও বলল দরিবুবু। আমি বলি কী বিবিজি, আপনার বড়ো ছেলে বরঞ্চ দরিবুবুর মাথার ওপর গিয়ে দাঁড়াক। মৌলবি হয়েছে বলে ছুনিয়াদারি করতে নাইকো?

স্বামীর কথাগুলো মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সাইদার।···ইসলাম যেমন ছুনিয়াদারি করতে বলছে মানুষকে, তেমনি আখেরাতের কাজও করতে বসেছে। তাই যে মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নমাজে বসে ছহাত তুলে মোনাজাত করে সেই মোনাজাতের মানে হল: 'হে খোদা! আমাকে ইহকাল-পরকালের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো দান করো।' ইসলাম ছুনিয়াদারিও চায়। ছুনিয়ার সেরা জিনিসগুলোও ভোগ করতে চায়। বদিউজ্জামান পরক্ষণে হাসতে-হাসতে বলতেন, তবে আমার যেন ছুনিয়াদারি সয় না। বড়ো ঝকমারি লাগে।

সাইদা বললেন, হ্যাঁ—নুরু বলছিল, এবার থেকে শাশুড়ির বিষয়সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হবে। মৌলাহাটওয়ালা ফরাজি হয়েছে। মনটা তো রাতারাতি বদলায় না।

আপনার মাথা খারাপ, বিবিজি? আয়মনি বলল। তার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ ছিল।···মুখে সব আল্লা আমিন করছে, এদিকে ভেতর-ভেতর যা ছিল তাই। লোকদেখানো ভড়ং। এখন পিরসায়েবসফরে বেরিয়ে-ছেন। গিয়ে দেখে আসুন গে, রাস্তায়-রাস্তায় মাঠে-ঘাটে আবার মেয়েলোকগুলো বেশরম ঘুরছে।

পেছন থেকে রোজি বলে উঠল, তুমিও বুঝি বেপরদা হয়ে ঘোর না আয়মনিখালা?

রোজি হাসছিল। আয়মনি বিব্রত ভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, সাইদা মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বললেন, ছি বউবিবি! আয়মনি বড়ো ভালো মেয়ে। আর বেপরদা হয়ে ঘোরে তো কী হয়েছে? চাষীবাড়ির বউঝিরা পরদা করে বসে থাকলে সংসার চলবে?

রোজি হাসতে-হাসতে সরে গেল। আয়মনি পির-জননীর হালহকিকতের খবর নিয়ে রুকুর কাছে গেল। উঁকি মেরে দেখেও নিল, ঘরের ভেতর বিছানায় বসে শ্যালা দামাঁদমিঁয়াটি ঠ্যাঙ দোলাচ্ছে। আয়মনি রুকুর কাছে দাঁড়ালে রুকু একবার নির্লিপ্ত মুখ তুলে তাকে দেখে নিল। তারপর লাল সুতোয় পদ্মফুল তৈরি করতে ব্যস্ত হল। আয়মনি একটা শ্বাস ছেড়ে আস্তে বলল, আসি রুকু। সনজেবেলা এসে তোমাদের নিয়ে যাব।···

হেমন্তসন্ধ্যায় এদিন আকাশে ঝলমলিয়ে চাঁদ উঠেছে। অলিগলি রাস্তা, তারপর পুকুরপাড় দিয়ে ঘুরে আয়মনি ডুবোনকে চুপচাপ নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মায়ের কাছে।

খিড়কির দরজায় লণ্ঠন রেখে দরিয়াবানু প্রতীক্ষা করছিল। পুকুরের জল ছুঁয়ে আসা একঝলক হাওয়া হঠাৎ হিম দিয়ে চলে গেল তার বাড়ির ভেতর। কেন যেন শিউরে উঠল দরিয়াবানু। চাঁদের আলোয় আবছা তিনটি মূর্তি সামনে দেখেও দরিয়াবানু চুপ।

আয়মনি বলল, কী হল দরিবুবু?

দরিয়াবানু লণ্ঠনটি তুলল। দুই মেয়েকে দেখল। তারপর বলল, আয়।

বারান্দায় লম্ফের আলোয় বসে মাহিন্দার বরকত গায়ে তেল মাখছে। শোবার আগে এই কাজটা সে করে। উঠোনে দুটো ধানের মরাই। তার ওপাশে দেয়াল ঘেঁসে হাঁসমুরগির দরমা। পেছনে গোয়ালঘর। এ বাড়ির চাল টিনের। মেঝেয় লাইমকংক্রিটের ওপর লাল পলেস্তারা। দুই বোনই লক্ষ করল, পলেস্তারা চটে গেছে অনেক জায়গায়। ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটি রেখে দরিয়াবানু হঠাৎ রুকুকেই বুকে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রোজি আর আয়মনি একটু অবাক।

একটু পরে চোখ মুছে রুকুকে, তারপর রোজিকে টেনে পাশে বসাল দরিয়াবানু। আয়মনি চৌকাঠের কাছে বসল কপাটে হেলান দিয়ে। দরিয়াবানু ধরা গলায় বলল, দুপুরবেলা হঠাৎ দেওয়ানসায়েব এসেছিল ঘোড়ায় চেপে।

রোজি চমকখাওয়া স্বরে বলল, বারিচাচাজি?

দরিয়াবানু তার থান কাপড়ের আঁচল খুঁটতে-খুঁটতে মুখ নামিয়ে বলল, আবার কাজিয়া করে গেল। বললে কী, একটা ছেলের জিন্দেগি আমি লষ্ট করে দিয়েছি। এটার ছাস্তি আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না। চাষার বেটি, মুরুক্ষু, হারামজাদি বলে একশো গাল-মন্দ!

রোজি থাপ্পা হয়ে বলল, তুমি কিছু বললে না?

দরিয়াবানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী বলব মা? আমিই তো মেয়েটাকে—আবার হু হু করে কেঁদে ফেলল সে।

রোজি বলল, মা! মা! তুমি কিচ্ছু কর নি। রুকু তো ভালো আছে। মেজোমিঁয়াও ভালো হয়ে গেছে কত্তো। রুকু, তুই বল্ না মাকে। চুপ করে আছিস কেন?

রুকু চুপ। আয়মনি একটু হেসে বলল, ছাড়ো তো দরিবুবু! দেওয়ানসাহেব লবাববাহাদুরের লোক—লবাববাহাদুর তো লয়কো যে তাকে এত ডর? কী ক্ষেতি সে করতে পারে? ভুঁইখেত যা-কিছু, সবই তো তোমার লিজের নামে কেনা। তুমার বিটি-জামাইরাই তা ভোগ করবে।

দরিয়াবানু রুকুর দিকে ঘুরল। আবার তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তবু রুকু চুপ। চুপ রোজি আর আয়মনিও।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে আবার চোখ মুছে দরিয়াবানু উঠে দাঁড়াল। আস্তে বলল, খইয়ের লাড়ু বানিয়ে রেখেছি। পাঠাই নি। আপন হাতে খাওয়াব বলে।

সিকেয় ঝুলন্ত হাঁড়ি নামিয়ে সেটি নিয়ে এল দরিয়াবানু। একটা নাড়ু রুকুর, আরেকটা রোজির মুখে গুঁজে দিল। আয়মনিকে বলল, বারাণ্ডায় কলসিতে পানি আছে। ওই ছ্যাখ কাঁসার গেলাস। পানি নিয়ে আয় তো বহিন!

আয়মনি ব্যস্তভাবে আদেশ পালন করতে গেল। দরিয়াবানু বলল, সকালে নুরুকে ডেকেছিলাম। বললাম, আমার তো আর কেউ নাইকো বাপজান তুমরা ছাড়া। পিরসাহেব দুনিয়াদারির ধার ধারেন না। কিন্তুক তুমাকে ভিনরাস্তায় হাঁটতে হবে—নইলে জো নাইকো। নুরু বলল, তার আপিত্য নাইকো। বললে পরে এবাড়ি এসেই থাকবে।

রোজি বলল, বিবিজির তবিয়ত ভালো না। দাদিশাশুড়িরও এখন-তখন অবস্থা। আমরা এলে চলবে?

দরিয়াবানু রুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, রুকু তো আছে।

বলে সে রুকুর মাথায় হাত বুলোতে থাকল। রুকু লাড়ু চিবুচ্ছিল। তেমনি নিশ্চুপ। আয়মনি দু গেলাস পানি খাটের পাশে প্রকাণ্ড সিন্দুকটার ওপর রেখে বলল, খুব ভালো কথা বলেছ দরিবুবু। ইটা একটা কাজের কথা বটে!

দরিয়াবানু রুকুর উদ্দেশে বলল, দেল (হৃদয়) শক্ত করো, বেটি! এই যে আমাকে দেখছ—আমি কী করে সংসার সামলেছি। তোমার আব্বাজান কী করে বেড়াত, মনে করে ছাখো। সেইসব কথা ভেবে দড়ো হও। বরাত বেটি! আমারই ভুলে তোর এই কষ্ট।

রোজি বলল, কিসের কষ্ট? ও কিছু না।

দরিয়াবানু ভাঙা গলায় বলল, সব কানে আসে। গাঁয়ের লোক কত হাসাহাসি করে। লোকু ছড়াদার সঙের গান বেঁধেছে। কুচ্ছোর শেষ নাইকো আমার নামে! রাগে দুখে ঘেন্নায় ছাতি ফেটে যায় রে!···

রোজির তাড়ায় বেরুনো গেল। বেশ রাত্তির হয়ে গেছে। হাঁড়ির নাড়ু বয়ে নিয়ে গেল আয়মনি। এবার তার হাতে দরিয়াবানুর লণ্ঠন। পুকুরপাড় থেকে চাঁদের আলোয় খিড়কির ধারে দাঁড়ানো মায়ের আবছা মূর্তিটা চোখে পড়ছিল ডুবোনের। রুকু বার-বার ঘুরে দেখছিল। মায়ের এই চেহারা সে কোনো-দিন ছ্যাখে নি।···

সে রাতে রুকু ঘুমোতে পারছিল না। মায়ের কথা ভাবছিল। পাশের জন্তুমানুষটি এ রাতে তার বউকে জ্বালাতন করে নি। কোবরেজের বড়ি নিজেই চেয়ে নিয়ে খেয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাঝরাতে হিমটা আরও ঘন হল। সেই হিম রুকুকে ধীরে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

আর সেই ঘুম ভোরবেলা ভেঙে গেল রুকুর—রোজির কোরানপাঠের সুর শুনে নয়, কী একটা প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে। নুরি কান্নাকাটি করে কী একটা বলছে শুনতে পেল। বেরিয়ে যেতেই নুরি হাহাকার করে বলে উঠল, ওরে বেটিরা! তোদের কপাল ভেঙেছে রে! তোদের মা ডুমুরগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে রে!

রুকু একপলক শুধু দেখল রোজিকে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যেতে। তারপর তার মাথা ঘুরে উঠল। সে কাঁটাগাছের মতো পড়ে গেল।···

[ক্রমশ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা—পাঠান্তর

সন্‌জীদা খাতুন

এক

কবিতার পিছনে কবির বাস্তব জীবন-কথা সন্ধান করা সংগত হোক না-হোক, কোনো-কোনো কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের মনে বাস্তব ঘটনার ছবি অনিবার্য-ভাবে জেগে ওঠে। ১৩০৯ সালের "স্মরণ" কাব্যে ওই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে প্রয়াত মৃণালিনী দেবীর শোকগাথা বিন্যস্ত হয়েছে, সে-কথা সকলেই জানেন। 'আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো / তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো / যেন আমি বুঝি মনে / অতিশয় সংগোপনে / তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ / আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।' "স্মরণে"র এই ব্যাকুল উচ্ছ্বাস তিরিশ বছর পরের অগ্রহায়ণে রচিত "মূল্যশোধ" কবিতা থেকে ক্রমে বিবর্তিত রূপে "শেষ সপ্তকে"র 'এক' নম্বর কবিতায় সংযত গভীর বেদনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। "মূল্য-শোধে" যে অনুভূতি বাস্তব স্মরণকালের অব্যবহিত বলে মনে হয়—ক্রমরূপান্তরে তা শিল্প হিসেবে হয়ে ওঠে সার্থকতর।

১ অগ্রহায়ণ তারিখাঙ্কিত "মূল্যশোধ" প্রথমে ১৩৩৯ সালের "রূপ-রেখা" পত্রে ছাপা হয়েছিল। "শেষ সপ্তকে"র ভাদ্র ১৩৮৩ সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে "মূল্যশোধ" এবং তার পাঠান্তরের সঙ্গে গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের ভেদ নির্দেশ[1] করা আছে। 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত '২৩৪' অভিজ্ঞানযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে "রূপ-রেখা"র ছাপা পৃষ্ঠার উপরে বয়োবৃদ্ধ কবির কম্পিত হস্তের কাটাকুটি এবং সংযোজন দেখতে পাওয়া যায়। একই বাচ্যার্থ প্রকাশের প্রকারভেদ এই তিন রূপে লক্ষণীয়। একই বক্তব্যকে একই ছন্দে কবিতায় সাজাতে কাটাকুটি করতে হয় কেন, সেইটি সন্ধানের বিষয়।

কবিতা হচ্ছে শব্দ আর নিঃশব্দের গ্রন্থনা। শব্দ যা বলে, নিঃশব্দের এলাকায় চলে তার দ্যোতনা। নিঃশব্দের সেই অবকাশ রেখে, শব্দকে থাকতে হবে

উচিত সীমার ভিতরে। অবনীন্দ্রনাথের বচন আছে—কী আঁকব আর কী লিখব কেবল সেই জানাটাই জানা নয়, কতটুকু আঁকব না, কতটুকু লিখব না—সেই জানাটাই আসল জানা।[2] শিল্পোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে এইবলবার আর না-বলবার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কবিতার কাটাকুটির ক্ষেত্রে শব্দ আর নিঃশব্দের সীমানির্ধারণ অন্যতম বিবেচনার বিষয় বলে মনে হয়।

"রূপ-রেখা"য় প্রকাশিত "মূল্যশোধ"—

তোমাকে পেয়েছি বলে জেনেছিলেম,
কোনো দাম করোনি দাবি।
দিন গেছে রাত গেছে,
দিয়েছ ডালি তোমার উজাড় করে।
একবার আড়চোখে চেয়ে
ভাণ্ডার ভরেছি অনায়াসে আনমনে।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে,
যাচাই করিনি
আপন গর্বে ছিলেম উদাসীন ॥

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তুমি আমার রাজা,
তোমাকে যা দিই—
তোমার রাজকর যে তার চেয়ে অনেক বেশি,
আরো দেওয়া হোলো না
কেননা, আরো যে আমার নেই।"
বল্‌তে বল্‌তে তোমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।
আজ তুমি গেছ চলে,
আর ফিরবে না কোন দিন।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা
নিয়েছি মাথায় তুলে, নিয়েছি বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে লুয়ে পড়েছে মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

প্রাণ ভরে উঠল বেদনায়
ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে।
এতদিনে তোমার দাম দেওয়া হোলো
পেলেম তাই পূর্ণ করে॥

'রূপ-রেখা'র ছাপা পৃষ্ঠাতে বর্জন-সংযোজন করা পাঠ—

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে
তাই যাচাই করিনি
কোনো দাম করোনি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় করে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে।
পরদিনে গেলেম ভুলে।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে॥

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই—
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি,
আরো দেওয়া হোলো না
আরো যে আমার নেই।"
বল্‌তে বল্‌তে তোমার চোখ এলো ছলছলিয়ে॥
আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসে
তুমি আর আসো না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,—
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে লুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হোলো বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

"শেষ সপ্তকে" মুদ্রিত পাঠ—

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করোনি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় করে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে;
পরদিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি;
আরো দেওয়া হল না,
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।
আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

বাক্‌ধ্বনি ব্যবহারের তুলনাত্মক সারণী

	মূল্যশোধ	দ্বিতীয় পাঠান্তর	শেষ সপ্তকের 'এক'
নাসিক্যব্যঞ্জন (ন ম ঙ হ)	৭৩	৬৪	৬৯
কোমলব্যঞ্জন (ত দ ল ব গ ড ড়)	১১১	১০২	১০৩
মধুরব্যঞ্জন (র)	৪১	৪০	৫০
উষ্ম ও উষ্মতাধর্মীব্যঞ্জন (শ স হ এবং উষ্মতা-ধর্মী স্বরান্ত চ ছ জ থ ঠ থ ফ ঢ ধ ভ)	৬৫	৫৪	৫৯
অবশিষ্ট উপাদান-জাতীয় ব্যঞ্জন (ক ট প রেফ)	৩৭	৩৬	৩৫
অর্ধস্বর / ব্যঞ্জন (ই়, এ়, ও়)	২৪	২৩	২৫
সংবৃত স্বরধ্বনি (ই উ)	৫৯	৫৩	৫৪
অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি (এ ও)	১৩৯	১২৮	১৩১
বিবৃত স্বরধ্বনি (আ)	৭৩	৬৭	৬৯
অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি (অ অ্যা)	১৯	২১	২৩
মোট ধ্বনি	৬৪১	৫৯৬	৬১৮

"মূল্যশোধে" ধ্বনিব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি—৬৪১টি। দ্বিতীয় পাঠে তার চেয়ে ৪৫টি ধ্বনি কম আছে—মোট সংখ্যা ৫৯৬। গ্রন্থে গৃহীত পাঠে আদি কবিতা থেকে ২৩টি ধ্বনি কমে গেছে—মোট ধ্বনির সংখ্যা ৬১৮টি। এই ধ্বনিসংযমের ফলে ব্যঞ্জনা কিছুই ব্যাহত হয় নি। বরং কতটা না-বললে না-বলা কথার ঝংকার পাঠকচিত্তকে রণিত করবে—সেই দিকে কবির দৃষ্টি সজাগ থেকেছে। স্পন্দিত অনুভূতিটিকে একবার লিখে ফেলবার পর সংস্করণের কালে সচেতন শিল্প-বিচার কবিকে আনুকূল্য দিয়েছে।

কবিতাটির আদিরূপে প্রেমের 'দামে'র প্রসঙ্গ এসেছে। চূড়ান্ত রূপে, শেষে একবার 'দাম' কথাটি থাকলেও অন্যত্র 'দামে'র স্থলে 'মূল্য' ব্যবহার করেছেন কবি। সাধুরূপের ওই প্রয়োগ বিষয়ের সমুচিত গাম্ভীর্যকে ধরেছে। 'শেষ সপ্তকে'র কবিতায় 'দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত'-এর সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে অনেক পরের চরণ 'দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত' উক্তি ভাষাগতভাবে প্রায়-সমতায় ছন্দের ইঙ্গিতে অবস্থাবিপর্যয় দ্যোতিত করে।

"মূল্যশোধে"র 'আজ তুমি গেছ চলে'-র পরে 'আর ফিরবে না কোনো দিন' বর্জিত হয়ে 'দিনের পর দিন আসে' ইত্যাদি চরণবিন্যাসে—দিনের পর দিন রাতের পর রাত চ'লে যাওয়ার সঙ্গে 'তার' চলে-যাওয়া, আর দিনের পর দিন রাতের পর রাতের আসার সঙ্গে 'তার' না-আসার ভাবগত বৈপরীত্য ধ্বনিত করছে সুচারু বিন্যাসের শিল্পসংগত কৌশলে। একে বলা যায় ভাবের ছন্দের ব্যঞ্জনা। এ ইঙ্গিত প্রথম পাঠে ছিল না।

'আড়চোখে চেয়ে আনমনে নিলেম' বললে 'আড়-চোখে' 'আনমনে' পদে আ-স্বরধ্বনির পর একটি হসন্তব্যঞ্জন, তারপরে ও-কারান্ত আর এ-কারান্ত ব্যঞ্জনের বিন্যাস 'আড়চোখে' চাওয়ার সঙ্গে 'আনমনা' ঔদাসীন্যকে ধ্বনিসূত্রে সম্পর্কবদ্ধ করছে। আবার 'শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে' চরণে 'পূর্ণিমা আর 'পূর্ণ' পদের ধ্বনির অতিসাম্য দূর করে 'শরতের পূর্ণিমা' দিয়েছিল তাকে স্পর্শ' পরিবর্তনে আরম্ভের অ-কারান্ত শ আর চরণ শেষের অ-কারান্ত শ-এর মিলে মৃদুতা এসেছে। অর্থের দিক থেকেও প্রেমের নিবেদনলগ্নে পরিবেশের সহযোগের ইঙ্গিতে বক্তব্যের সংগতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কবিতাটির শেষ পাঠে যে বাক্‌সংযমের কথা বলেছি, তার আরও একটু অবকাশ ছিল মনে হয়। কে জানে, অহরহ কর্মব্যস্ত কবি উপযুক্ত অবসর পেলে হয়তো এই পরিবর্তনের জন্যে কলম তুলে নিতেন। নায়কের উদাসীন গর্ব যখন লোকান্তরিতা গৃহলক্ষ্মীর চরণচিহ্নের কাছে অবনত, তখনই বক্তব্যের পূর্ণচ্ছেদ ঘটতে পারত। প্রেমের দাম দেওয়া হল, বা পূর্ণ করে পাওয়া হল—খুলে বলবার প্রয়োজন ছিল না আর। এ বিবৃতি যেন এসে গেছে নিছক প্রথম লেখা রূপটির "মূল্যশোধ" নামের পথ ধ'রে। "মূল্যশোধে"র 'তুমি আমার রাজা', 'আর ফিরবে না কোনোদিন', বা 'প্রাণ ভরে উঠল বেদনায় / ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে' যেমন দ্বিতীয় পাঠে সম্মার্জিত হয়েছে, শেষ দুই চরণের বিবৃতি দুটিও তেমনি পরিত্যক্ত হতে পারত।

এ-রকম বর্জনের নজির আছে রবীন্দ্রনাথে। যেমন শতবার্ষিকীসংকলন 'বিচিত্রা'য় দেখি, "শিশুতীর্থে"র পাণ্ডুলিপিচিত্রের শেষ দুই চরণ মুদ্রিত পাঠ থেকে অপসৃত। গৃহীত পাঠের কবিতার অন্তিম পদ—'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।' পাণ্ডুলিপিচিত্রে দেখা যায় এরপর আরো ছিল—'পূর্ব-দেশের বৃদ্ধ মনে মনে বল্‌লে, / "আমার দেখা হোলো।" ছাপবার সময়ে এই দুই পংক্তি ছাঁটাই করে জয়ধ্বনির রেশ ছড়িয়ে যাবার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

দুই

বর্জন আর সংযোজন করতে-করতে কখনো-কখনো এক কবিতা থেকে জন্ম নিয়েছে দুই কিংবা তার অধিক কবিতা। "কল্পনা" কাব্যের "দুঃসময়" ও "অসময়"

কবিতা, আর এ দুয়ের মূল 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থে মুদ্রিত "স্বর্গপথে" কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্রের কথা সকলেই জানেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, সঞ্চয়িতা, বা স্বতন্ত্র কাব্যগুলির নতুন সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে কবিতার পাঠান্তর সংক্রান্ত নানা তথ্য আছে। যেমন, ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আলমোড়ায় বসে লেখা 'ছড়ার ছবি'র পাণ্ডুলিপিতে (১৭৮ক) 'বইচে নদী বালির মধ্যে' আর 'মরুর মতো ডাঙা' ছত্র দিয়ে শুরু দুটি পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্জন আর যোজন করতে-করতে সেই দুটি কবিতা 'রিক্ত' নামে একটি কবিতার রূপ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তী রূপান্তরকেই সর্বদা মান দিয়েছেন এমনও নয়। একটি কবিতার ক্ষেত্রে, পূর্ব রূপটিকেই গ্রাহ্য করার ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে। কবিতাটি "কল্পনা" গ্রন্থের "চৌরপঞ্চাশিকা"। 'ভারতী'র ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ওই কবিতার একটি গম্ভীর রূপ ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ১৩০৭ সালে প্রকাশিত "কল্পনা"য় মুদ্রিত হল পাণ্ডুলিপিতে একদা 'নির্মম ভাবে লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত' পাঠ।[৩] 'কল্পনা'য় গৃহীত পাঠের প্রথম স্তবকের পরে গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত 'ভারতী'তে ছাপা পাঠান্তরটির প্রথম স্তবক উৎকলন করছি।

১. ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনকচাঁপার ডোর।
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশয্যায়
ওগো সুন্দর চোর—
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর।

২. বহুবর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়
বেদনাবিহীন—
দীপ্তশিখাসম তব স্পন্দিত হৃদয়
স্তব্ধ বহুদিন—
হে বিহ্বল কবি,
বিদ্যা তব কনকচম্পকগৌর ছবি
মধ্যাহ্নে খসিয়া-পড়া চম্পকের মতো
ধূলিশয্যাগত
বহুবর্ষশত।
বিরহের মিলনের স্তম্ভীব্র তাপন
চিরসমাপন।

গ্রন্থে গৃহীত কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবাহিত। এই তানময়গতি প্রাচীন কবির কাব্যে কীর্তিত বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনীর স্মৃতিচারণের জন্যে সংগত দূরকালের মহিমার অনুকূল বলে বোধ হয় না। তদুপরি, 'চোর' শব্দ সম্পর্কে আমাদের বদ্ধ সংস্কার 'ওগো চোর' সম্বোধনে প্রীতি অনুভব করে না। অন্ত-পক্ষে, 'বিহ্বল'কে সম্বোধন করে, তাঁর শ্লোকধৃত প্রণয়ের স্মৃতি প্রসঙ্গ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যোগ্য গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য পেয়েছে 'কল্পনা'র 'চৌরপঞ্চাশিকা'র তারিখ '২৩ বৈশাখ ১৩০৪, পরিবর্তিত পরিবর্ধিত: ৪ জ্যৈষ্ঠ'। আর গম্ভীর ছন্দের পাঠটির তারিখ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪। অর্থাৎ কবি নিজেই যোগ্যতর অবয়ব সন্ধান করে কবিতার রূপান্তর সৃষ্টি করেও, পরে অজ্ঞাত কারণে পূর্বতন পাঠটিকেই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। কোথাও কোনো বোঝাবুঝির ভুলে এ প্রমাদ ঘটেছে কি?

তিন

পাঠান্তরের ক্ষেত্রে ছন্দান্তরই আমাদের বেশি চমকিত করে। কারণ, আমরা জানি কাব্যছন্দ মৌল অনুভবের স্বর থেকেই আপন স্পন্দ বুঝে নেয়। ছন্দে ঠিক স্পন্দটি না-এলে কবিতা গতি হারাবে। যেমন ঘটে-ছিল "খেয়া"র "প্রভাতে" কবিতার পূর্বরূপের ক্ষেত্রে। "স্মরণে"র পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে ৮+৬ পর্বের অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে শুরু করে কাটাকুটি করতে-করতে তখনকার মতো সে-কবিতা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে-

ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মজুমদার পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডে (যাতে "স্মরণে"র কবিতা লেখা হয়েছিল)-র পাতায় লেখা হয়েছিল—'পরিপূর্ণ আজি মোর অশ্রু-সরোবর / কূল ছাপাইয়া গেছে দিক্ দিগন্তর, প্রভাতে উঠিয়া দেখি / মাঝে ফুটিয়াছে একি / শতদল পদ্ম-খানি সম্পূর্ণ সুন্দর!'

'সমস্ত আকাশ আজি তারি মুখ'পরে / নীরবে চাহিয়া আছে পরম আদরে / বাতাস থামিয়া আছে / সুদূর তীরের কাছে- / বিহঙ্গ গাহে না গান জানি না কি বিস্ময়ের ভরে।' এই পাঠের নানান জায়গায় কেটে নতুন পংক্তি কিংবা পদযোজনা করে দীর্ঘতর ৮+১০ মাত্রার পর্ব বিন্যাস করে লিখবার চেষ্টা করেছেন। উপরের উদ্ধৃতিটির শেষ চরণটি বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে দেখে মনে হয়, ওই ছত্র লিখবার আগেই তার উপরের অংশগুলির পর্বের মাত্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন কবি। তাই এই চরণটিতে কাটাকুটি ছাড়াই ৮+১০ মাত্রার পর্ব পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ পর্ববিন্যাসেও কবিপ্রেরণা আর বোধির সংশ্লেষণে সম্ভূত স্পন্দ কাব্যছন্দে প্রাণ পেল না। এই গঠনেও ছন্দ প্রায়শ হোঁচট খেয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। 'এক বরষার রাতে এ আমার অশ্রুসরোবর / কূল ছাপাইয়া গেছে কোথা চলি দিক্‌দিগন্তর / প্রভাতে উঠিয়া দেখি / মাঝে ফুটিয়াছে একি / শূন্যবনে এক-মাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর / সমস্ত আকাশ আজি অনিমেষ তারি মুখপরে / নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে সু-গভীর প্রশান্ত আদরে।' বাকিটা যেমনকার তেমনি আছে। আগাগোড়া খসড়াটি উপর-নিচে টানা দাগে কেটে দেওয়া রয়েছে।

"খেয়া" কাব্যগ্রন্থের শ্রাবণ ১৩৬৩ সংস্করণে "প্রভাতে" কবিতার মুখোমুখি ওই পাণ্ডুলিপিচিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। "খেয়া" কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহজ স্রোতে কবির উপলব্ধিটি সত্যি-সত্যি 'সম্পূর্ণ সুন্দর' পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। এক রজনীর বরষনে শুধু / কেমন করে / আমার ঘরের সরোবর আজি / উঠেছে ভরে / ···হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু / সলিল-মাঝে / আজি এ অমল কমলকান্তি / কেমনে রাজে। / একটিমাত্র শ্বেতশতদল / আলোক-পুলকে করে ঢলোঢল্, / কখন ফুটিল বল্ মোরে বল / এমন সাজে / আমার অতল অশ্রুসাগর- / -সলিল মাঝে!'

'খেয়া'র গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে—'মূল রচনার কাল ১৩০৯ পৌষের ৭ হইতে ১১ তারিখের মধ্যে; খেয়ার কবিতাটি ১৪ শ্রাবণ ১৩১২ তারিখে রচিত।' তাহলে চূড়ান্ত গঠনের সঙ্গে আদি খসড়ার ব্যবধান তিন বৎসর কালের।

চার

গান থেকে কবিতা, আবার কবিতা থেকে গান সৃষ্টি করবার ফরমায়েশি কাজে রবীন্দ্রনাথকে আমরা গররাজি দেখি নি। "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের ইতিহাস, এবং সে-গ্রন্থে গানকে কবিতা করে তোলা, পরে আবার সেই কবিতাতে সুরারোপের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতা রচনার বেলাতেও সৃষ্টির খেলায় তাঁকে আমরা অক্লান্ত দেখি। কাব্যছন্দে বাঁধা উৎকৃষ্ট কবিতার বক্তব্যকে গদ্যছন্দের ধাঁচে সাজিয়ে কবিতা গড়েছেন—এমন নজিরও তাঁর রচনায় রয়েছে। এতে তফাত কী দাঁড়ায় তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১৯৩৪ সালের ১৩ সেপটেমবরে লেখা "অবরুদ্ধ ছিল বায়ু" ("প্রান্তিক") কবিতা, আর ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত "শেষ সপ্তকে"র "আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি"—একই বাচ্যার্থের এই দুটি কবিতাকে নিয়ে আমরা প্রসঙ্গটি বুঝবার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে রচনাকালের উল্লেখ নেই। তবু নানা কারণে "শেষ সপ্তকে"র কবিতাটিকেই পরবর্তী রচনা বলে মনে হয়। ওই কাব্যের গ্রন্থ-পরিচয়েও এরকমই বলা হয়েছে—'শেষ সপ্তকের

তেইশ সংখ্যক কবিতার সহিত প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো সংখ্যক কবিতা তুলনীয় : ছন্দোবদ্ধ ঐ···কবিতার রচনা···১৩/৯/১৯৩৪ [২৭ ভাদ্র ১৩৪১] ···তারিখে, ফলতঃ শেষ সপ্তক-ধৃত কবিতার পূর্বেই মনে হয়'। "প্রান্তিক" গ্রন্থের শেষেও 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' কবিতার ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—'১৫ সংখ্যক কবিতাটি 'বিচিত্রা'র ১৩৪১ কার্তিক-সংখ্যায় 'শরৎ' নামে মুদ্রিত হয়। শেষ সপ্তকের তেইশ-সংখ্যক কবিতা ইহার গদ্য রূপান্তর বলা যাইতে পারে।'

"অবরুদ্ধ ছিল বায়ু" কবিতাটি সাধুভাষায় সমিল প্রবহমান ছন্দের দীর্ঘ পংক্তিতে নিবদ্ধ। কবিতার মোট ১২৫৬টি ধ্বনির ভিতরে ব্যঞ্জন ধ্বনি ৬২০টি, অর্ধব্যঞ্জন ২৫টি, আর স্বরধ্বনি ৫১১টি।

নাসিক্যব্যঞ্জন ঙ ন ম কবিতায় আছে ১১৭টি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো ৫টি অনুনাসিক স্বরের নাসিক্যব্যঞ্জনা। ছুয়ে মিলে সংখ্যার হিসেবে ১২২টি। উষ্মতাধর্মী ধ্বনিই এই কবিতায় সবচেয়ে বেশি। ৬৭টি শ স হ, ৫৪টি স্বরান্ত চ ছ জ ঝ, ৩৭টি স্বরান্ত খ ঘ ঠ থ ধ ভ, আর ২টি খণ্ড-ৎ—মোট ১৬০টি। এই ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে ৪৪টি ধ্বনিতে, সংলগ্ন নাসিক্য-ব্যঞ্জন আপন প্রভাব বিস্তার করেছে।[৪] ১২২টি নাসিক্যধ্বনির সঙ্গে ৪৪টি উষ্মধ্বনিতে সঞ্চারিত নাসিক্যব্যঞ্জনা একত্রে হিসেব করলে ১৬৬টি নাসিক্য-গুণান্বিত ধ্বনি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির মোট পরিমাণকে ছাপিয়ে যায়। তবে ১৬০ আর ১৬৬তে প্রভেদ তত বেশি নয়। ব্যঞ্জনগুলির ভিতরে এই দুই ধ্বনির প্রভাবই কবিতাটিতে প্রধান। এখানে উল্লেখ করা ভালো, নাসিক্যগুণ কেবল উষ্মব্যঞ্জনেই সঞ্চারিত হয়, এমন নয়। নাসিক্যব্যঞ্জন আপনার উভয় পার্শ্বের যে-কোনো ধ্বনিতেই মধুর ব্যঞ্জনা বিস্তার করে। তবে অন্যান্য ধ্বনির চেয়ে উষ্মধর্মের উপর এই গুণের প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যবহ বলে এ আলোচনা অপরিহার্য হয়। উষ্মধর্মের দীর্ঘশ্বাসে মাধুর্যগুণের সংযোগ দুঃখবেদনার সঙ্গে মধুর অনুভবের মিশ্র বোধ সূচনা করে।

মধুর আর কোমলস্বভাবী অন্য ধ্বনির সংখ্যাও এই কবিতায় কম নয়।

ত ৬৫টি, ল ৪৪টি, অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোষ ব্যঞ্জন—হসন্ত জ ১, গ ১৬, দ ২৪, ব ৩৭, ড় ২, রেফ ১২টি, আর র ৭২টি। মোট ২৭৩টি। ৩৪টি ক, ৩টি ট, ২৯টি গ, আর ৪টি হসন্ত চ—এই ৭০টি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনা-শক্তিতে লঘু উপাদান শ্রেণীতে ফেলা যায়। ব্যঞ্জন-ধ্বনির হিসেব থেকে বলা চলে উষ্মতাধর্মী ধ্বনির যথেষ্ট সদ্ভাব সত্ত্বেও নাসিক্যব্যঞ্জনার অধিকতর প্রভাব এবং কোমল ও মধুর ধ্বনির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কবিতাটিতে কোমল মধুর স্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বরং কোমল মাধুর্যের সঙ্গে উষ্মতার যোগ উপলব্ধির নিবিড়তা নির্দেশ করছে।

এইবার পুরো কবিতাটি সংকলন ক'রে বাচ্যার্থের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার ;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা ;
ক্লান্তিভারে ঝিঁঝিপাতা বন্ধপ্রায়।
শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন স্থবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিম দিগন্ত পারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

সহমরণের বধূর সঙ্গে সমতা ঘোষণার দরুন, কবিতাতে মৃত্যুর সাথে বোঝাপড়ার একটি ব্যাপার আছে মনে হয়। "প্রান্তিক" কাব্যগ্রন্থ রোগমুক্তির পরবর্তী কাব্য হিসেবে সুপরিচিত বলে মৃত্যুপ্রসঙ্গের কথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কবিতাটির রচনাকাল ইংরেজি ১৯৩৪ সাল। সমগ্র "প্রান্তিকে" ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর কবিতা তিনটি এ কাব্যের অন্যান্য কবিতার বছর তিনেক আগে লেখা কিন্তু ১৩৪১ সালের ১৫ বৈশাখ তারিখেই ১৪-নম্বর কবিতায় কবি লিখছেন—'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'। ১৬-নম্বর কবিতা আরো আগের, ৭ বৈশাখ ১৩৪১ তারিখের। এই সনেটটিতে পথিক হিসেবে দ্রষ্টা কবি এ-জগতের কীর্তিনাশা ধারা প্রত্যক্ষ করে শেষে যদিও বলছেন 'তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে / অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে' —তবু, জাগতিক বিনাশের কথা তাঁর চেতনায় জাগরূক—সে সংবাদ পাচ্ছি। ১৫-নম্বর কবিতা 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু'র প্রস্তাবনাতেই সূর্যের বিরুদ্ধে মেঘের অবরোধব্যূহের ছবি আলোর সঙ্গে ঘোর অন্ধকারের বিরোধের সূত্রে শ্বাসরোধকারী আবহ তৈরি করে। তারপরেই ওই অবরোধের তুলনা হল 'ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা'।

পরের স্তবকে 'শরৎ'-এর জয়শঙ্খ আলোর অপরাজেয় দীপ্ত বিকাশে উঠল ঝলমলিয়ে। 'শরৎ' কবিতাটির আদিনাম, রচনাকালও শরৎ। ফলে বর্ষার ঘনঘটাকে অকলঙ্ক হাস্যচ্ছটায় অবহেলে অপস্তৃত করবার এই বাণীকে ঋতুগাথা মনে করবার বাধা হয় না। কিন্তু ভিতরমুখে চরণ চলেছে এর পর। পরিবেশবর্ণনার অন্তে তরুণ আলোকে অনির্বচনীয় নবীনের দর্শন পাবার কথার সূত্রে এল আত্মপ্রসঙ্গ। তীর্থযাত্রী কবি যেন দূর ভবিষ্যতের তীর থেকে বিপরীত স্রোতে ভেসে চলে এসেছেন আলোকিত বর্তমানে। এবারে এল "প্রান্তিক" কাব্যের বহু-আলোচিত সত্তাদর্শনের প্রসঙ্গ 'আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি/অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি, সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন'। "প্রান্তিকে"র কবিতা শারীরিক অতীতকে খুলে নেবার কবিতা।[৫] প রিষ্কার বলা হল—'পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,/নূতন বাহিরি এল, তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়/ঘুচাল সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়, প্রকাশিল তার স্পর্শে'। এই বিকাশের বিস্ময়কর নূতনত্ব এইখানে যে, প্রভাতের গানে রজনীর মৌন যুক্ত হওয়াতে এ আলো অবিমিশ্র উজ্জ্বলতার প্রকাশ নয়। এই নূতন স্পর্শে অভাবনীয়, শ্রবণে বিমিশ্র, দৃশ্যে নামহীন, রহস্যে নিবিড়।

পশ্চিমদিগন্তের ওই মৃত্যুঘনিমা সত্ত্বেও কবিতার শেষ স্তবকে চিরযাত্রী আত্মপরিচয়ে ভাস্বর কবি-হৃদয়ে মুক্তিমন্ত্রের সংগীত বেজে উঠল। তুলনা দেওয়া হয়েছে সংসারযাত্রার প্রান্তে উপনীত সহমরণের বধূর অবস্থার সঙ্গে।

প্রান্তিক অনুভবের কবিতাই বটে। কিন্তু এর জন্যে বাস্তবিক কবির রোগাক্রান্ত দশা পার হয়ে আসতে হয় নি। এ কবিতা রচনার আগে কবি সিংহল ঘুরে এসেছেন। ২৬ আর ২৭ শ্রাবণ হলকর্ষণ উৎসব উপলক্ষে "শ্রাবণ-গাথা"র অভিনয়ে "নটরাজ" ভূমিকায়

অভিনয় করেছেন। ৩১ অগসট সদ্যকারামুক্ত সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের ‘যথোচিত সংবর্ধনা’র আয়োজন করেছেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রম-বাসীদেরকে কিছু-না-কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছেন। সান্ধ্যবৈঠকে কখনো-কখনো টেনিসন বা ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়ে মুখে-মুখে তার অনুবাদও করছেন। ২১ অকটোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন মাদ্রাজে।[৬]

ওই কবিতা রচনার ঠিক পরদিনে লেখা “প্রলয়” ঠাঁই পেয়েছে “বীথিকা” কাব্যে (ভাদ্র ১৩৪২)। “বীথিকা”য় ছাপা নানা কবিতায় রচনার তারিখ ১৯৩২, ১৯৩৪, ১৯৩৫। জীবনের শেষভাগে পরের কবিতা আগের গ্রন্থে, আগের কবিতা পরের গ্রন্থে ছাপানো চলছিল। “প্রান্তিক” থেকে “শেষ লেখা” পর্যন্ত কবিতা রচনায় ‘ছড়িয়ে-পড়া বিশৃঙ্খল মনকে কোনো-একটা কেন্দ্রের দিকে নিয়ে আসার কাজে রুগ্‌ণতা’ সাহায্য করেছে কিনা—শঙ্খ ঘোষের এই প্রশ্ন ‘অবরুদ্ধ ছিল বায়ু’ কবিতার ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে যায়। শঙ্খ ঘোষ রুগ্‌ণতা প্রসঙ্গটির বিস্তার করে আরো বলেছেন—‘দুঃখের নিবিড় উপলব্ধির মতো এ হয়তো সূক্ষ্ম মনের কাছে তীব্রভাবে অস্মিতা-সূচক, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এ এক যোগ্য মুহূর্ত। এই রুগ্‌ণতার আঘাতে এল শূন্যের বোধ, গহ্বরের বোধ, আর তারপরেই সে-গহ্বর দ্রুত ভরে উঠতে লাগল জ্যোতির্মণ্ডলে, আর এই ভাবে একাকার হয়ে এল দৃশ্য আর দ্রষ্টা।’[৭] কোনো দুঃখের নিবিড় উপলব্ধি আলোচ্য কবিতার উৎস হয়েছিল কিনা সে-ইতিহাস কবির জীবনচরিতে পাই না। অভাবে, বার্ধক্যজনিত মৃত্যুভাবনার পীড়ায় কি কবি এমন চেতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন যা-থেকে মৃত্যু-মুখী রোগের আক্রমণের পূর্বেই তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছিলেন আপনার বাহিরে ?

পাঁচ

“শেষ সপ্তকে”র ‘আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি’ কবিতাও কবির আশি বছর বয়স পার হবার পরের রচনা। এখানেও ‘দৃশ্য’ আর ‘দ্রষ্টা’র একাকারত্ব ঘটিয়ে কবি বলছেন—‘আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে’। রচনাশৈলীর দিক থেকে পার্থক্য হয়েছে কথ্যভাষায় অসমপংক্তির গদ্যছন্দে বক্তব্য বিন্যাসের ফলে। সমিল প্রবহমাণ ছন্দে সাধুভাষায় আবেগের যে চাপ এবং তরঙ্গময়তা অনুভব করা গেছে, গদ্যছন্দে সেই চাপ মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ গতি এসেছে।

“শেষ সপ্তকে”র গদ্যকবিতার ভাষায় আর ‘কথার’ বা ‘খবরদেবার ভাষা’য় তফাত আছে কি নেই, তা নিয়ে খানিকটা বাদানুবাদের সুর শোনা যায় কবির উক্তিতে। ‘অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত ক’রে নিয়ে যায়, কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক ক’রে রাখতে হয়।’[৮] পত্রেও ক্ষোভ জানিয়েছেন ‘লেখাগুলোর ভিতরে-ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই···চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি।’[৯]

‘অবরুদ্ধ ছিল বায়ু’ লিখবার কালে আবেগমুক্তির পরেই এর রূপান্তর রচনা হয়েছে মনে করা যায়। আবেগসংক্রমিত চিত্তের কবিতা, আর তার পরের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এখানে উদ্ধৃত করি—‘কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই

কবিত্বের রং ফোটে ভালো’।[১০] উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য কবির আবেগের মূহূর্তটি বিষয়ে অবহিত নই। ছন্দোবেগের সূত্রে প্রথম কবিতায় আবেগের যে-চাপ অনুভূত হয়, দ্বিতীয় কবিতায় তা সে মাত্রায় নেই—এইটুকু শুধু বলা যায়। ‘জীবনস্মৃতি’ থেকে উদ্ধৃত কবির উক্তি অনুসারে অনুমান করতে হয়, প্রথম কবিতাও তাহলে আবেগের সঙ্গে অব্যবহিত নয়। কারণ, ‘অবরুদ্ধ ছিল বায়ু’ কবিতার গাঢ় ভাব-ব্যঞ্জনাকে ‘গদ্‌গদ’ ভাষ বলা চলে না। কবির হৃদয়াবেগের সঙ্গে প্রথম কবিতা রচনাকালের ব্যবধান থাকুক না-থাকুক, দ্বিতীয় কবিতার সঙ্গে খানিক ব্যবধান ঘটেছে ঠিকই। এ-অবস্থায় ব্যবধান সংক্রান্ত অনুমানের পথ ছেড়ে বাস্তবে কবিতা দুটিতে কবিত্বের রং কেমন ফুটেছে, তাই দেখতে হবে।

‘শেষ সপ্তক’ গ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক একটি পত্রে কবিতায় বর্ণিত বোধের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন। ‘জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে—এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফিরবার মুখে—বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়।’[১১] ‘অবরুদ্ধ’ শব্দটি এই সময়কার বিবরণেও চলে এসেছে। বাস্তবিক বিষয়টির গাম্ভীর্য ভাষার ওই গুরুত্ব দাবি করে। তবে, কোনো বিষয় সন্তোষজনকভাবে বলা হয়ে যাবার পর, ফিরে বলতে গেলে সহজ হয়ে ওঠে বলেই হয়তো ‘আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি’ কবিতা ভাষা এবং বলার ভঙ্গিতে সেই সহজতা পেয়েছে। এই ভাষান্তর এবং ছন্দান্তরে কবিতাটির ধ্বনিব্যবহারের খতিয়ান নিয়ে দেখবার আগে কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক।

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখে
যা দর্শন হারিয়েছে।
কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছে উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।
আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ খেল খসে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।
আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক’রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

কবিতাটির মোট ৯১৬টি ধ্বনির ভিতরে ব্যঞ্জন-ধ্বনি ৪৮৮টি, অর্ধব্যঞ্জন ৩০টি, আর স্বরধ্বনি ৩৯৮টি। নাসিক্যব্যঞ্জন কবিতায় আছে ৮৩টি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো ৪টি অনুনাসিক স্বরের নাসিক্য ব্যঞ্জনা। ছুয়ে মিলে সংখ্যার হিসেবে ৮৭টি। সংখ্যার দিক থেকে উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনই সর্বাধিক। ৩৭টি শ স হ, ৫২টি স্বরান্ত চ ছ জ ঝ, ৩১টি স্বরান্ত খ ঘ ঠ থ ধ ফ ভ, ৩টি হসন্ত খ (দেখলেম, চোখ, দেখতে) ১টি খণ্ড-ৎ। মোট ১২৪টি উষ্মতাবিস্তারী ধ্বনি। এই ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে ২৮টি ব্যঞ্জনে নিকটবর্তী নাসিক্য-ব্যঞ্জনের গুণ সঞ্চারিত হয়েছে।[২২] ৮৭টি নাসিক্য-ধ্বনির সঙ্গে ২৮টি নাসিক্যগুণান্বিত মোট ১১৫টি ধ্বনির সংখ্যা উষ্মতাবিস্তারী ধ্বনির চেয়ে কমই হয়। ৯টি ধ্বনির তফাত। এ কবিতার ক্ষেত্রেও ১২৪টি ধ্বনির উষ্মতা আর ১১৫টি ধ্বনির নাসিক্যগুণের প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে। মূল কবিতাটির মতো এই কবিতাটিতেও কোমল ও মধুর ধ্বনি বিস্তর। ত ৫৮টি, ল ২৬টি, অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোষ ব্যঞ্জন—গ ১১, ড ১, ড় ১, দ ২০, ব ১৯, হসন্ত জ ৫, রেফ ৯, আর র ৭২টি মোট ১৩৮টি কোমল মধুর ব্যঞ্জনাময় ধ্বনি। ২৮টি ক, ১টি ট, ২৮টি গ, ১টি হসন্ত চ, আর 'দেখছি' পদের ১টি হীনপ্রাণ খ—এই ৫৯টি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনাশক্তিতে লঘু উপাদান-শ্রেণীতে ফেলব। উষ্মতাগুণান্বিত ধ্বনি কিছু বেশি হলেও, শেষ পর্যন্ত ১৩৮টি মধুর কোমল গুণের ধ্বনির প্রভাবে "সহমরণে"র হুতাশের চেয়ে "বধূ"র অন্তরমাধুর্যের ভাবই কবিতার মূলস্বর হয়ে ওঠে। জীবনআকাশের আলোর ম্লানিময় অবরোধের অনুভব থেকে একাকিত্বের পীড়া, শূন্যতা বা গহ্বরের বোধ জাগালেও সে-গহ্বর দ্রুতভরে উঠতে থাকে 'জ্যোতি-র্মণ্ডলে'। মৃত্যু বা জরার আবরণ ছিন্ন হয়ে চির-যাত্রীর চোখে ভেসে ওঠে চিরজীবন।

ধ্বনিব্যবহারপ্রণালীর দিক থেকে দুই কবিতায় সাযুজ্য রয়েছে। বক্তব্যবিন্যাসে, আরম্ভেই কিছু কাট-ছাঁট দেখা যায়। যেমন, মূল কবিতার অবরোধের কথা আর ছবি পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় রূপে। 'প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ' উল্লেখে সংক্ষেপে জীর্ণতার বা পুরাতনের ক্লান্তির ইঙ্গিত এসেছে। শরতের আলোয় নতুন করে দেখা হল—সরাসরি এইটুকু খবর দেওয়া হচ্ছে। শরতের আবির্ভাব বর্ণনার জাঁকও এ কবিতা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সাধু-ভাষায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঐ ভূমিকা আর জাঁক সংগত হলেও, কথ্যভাষার গদ্যছন্দে বেমানান। "প্রান্তিকে"র কবিতার প্রথম স্তবকের ৭টি চরণ আর দ্বিতীয় স্তবকে শরতের অবতারণের জন্যে লেখা ৫টি—মোট ১২টি, কিংবা, দুই স্তবক সন্নিহিত প্রান্তবর্তী ভাঙা চরণ দুটি জুড়ে নিয়ে বলা যায় ১১টি চরণের বদলে, রূপান্তরে মোটামুটি ছোট দৈর্ঘ্যের ৫টি চরণে উপক্রমণিকা হয়ে গেল।

প্রথম কবিতার ২৪ ছত্রের দ্বিতীয় স্তবক গদ্যছন্দে দু-টুকরো হয়ে গেছে। প্রথম ভাগে নাতিদীর্ঘ ১৫টি লাইন, দ্বিতীয় ভাগে তার চেয়ে দীর্ঘ ১৩টি লাইন গুনতিতে ৪ ছত্র বেড়ে গেলেও—মোট ধ্বনির হিসেবে 'প্রান্তিকে'র কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে যেখানে মোট ৮২৪টি ব্যঞ্জন, অর্ধব্যঞ্জন আর স্বরধ্বনি, সেখানে 'শেষ সপ্তকে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে একত্রে ৬০৯টি ব্যঞ্জন অর্ধব্যঞ্জন আর স্বরধ্বনি। রূপান্তরের অংশকেই অল্প-তনু বলতে হবে।

কিন্তু, প্রসঙ্গের সরাসরি অবতারণার ফলে জীবনের বহু ব্যবহার-জীর্ণতার কথা তেমন ক'রে বলা হয়নি বলেই বুঝি দ্বিতীয় স্তবকে 'অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে'র নিজের দিকে নিজের 'উৎসুক চোখে' তাকিয়ে থাকবার কথা আর একবার বলা হল। তা হোক, এই দ্বিতীয় উল্লেখও পাঠকের মনে পুনরাবৃত্তির বোধ জাগায় না। মূল কবিতাতেও এ-কথা বার কয় আছে। তাতে আপনার জীর্ণতাছেদী নবীনরূপ দেখবার ঐকান্তিক ইচ্ছাটিকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পাঠের তৃতীয় স্তবকে আবার সে কথার পরপর

একাধিক উল্লেখে সৃষ্টি-কাজে অপেক্ষিত নির্মমতার অভাব অনুভব করি। 'জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে/যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত, / যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর/তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে'। নগ্নচিত্ত সমস্তের মাঝে মগ্ন হ'য়ে অস্তিত্বের অনির্বচনীয় এবং সামগ্রিক মূল্যে উদ্ভাসিত হল—এই প্রসঙ্গের মাঝখানে আর-একবার জীর্ণ উত্তরীয় খসে যাবার কথা কি এমন অপরিহার্য! তাছাড়া, 'যার' 'যা' 'তার' পদ প্রয়োগে বক্তব্য বিষয়কে পরস্পর অন্বিত করাতে ভাষায় আড়ষ্টতা এসেছে। উপরন্তু, প্রকাশভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে সংহতির অভাব।

পরের পর্যায়েই রহস্যের যবনিকা চঞ্চল হয়ে উঠছে আশ্চর্য বাঙ্ময়তায়। তৃতীয় স্তবকের শেষ দুটি ছত্রে প্রকৃতির ছবি এঁকে সেই বাণীর বর্ণোজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে / প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।' কিন্তু তার আগের বিবৃতি যেন বোবা হয়ে রয়েছে। 'যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি / জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত / আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন'। ভাষায় সে-মৌন খুলেছে কি? মূল কবিতার 'রজনীর মৌন সুবিপুল / প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল; কালো তার চুল / পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায় / বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।'—অনেক সংহত প্রকাশে ব্যঞ্জনায় মুখর। কিন্তু রূপান্তরে প্রকাশটি না হল বিশদ—না ইঙ্গিত-স্পন্দিত।

দ্বিতীয় স্তবকেই 'অনাগত যুগ থেকে' ভেসে আসা 'তীর্থযাত্রী'র সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে গেছি। চতুর্থ স্তবকে আবার জানানো হচ্ছে 'আমার এতকালের কাছের জগতে / আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক'। "প্রান্তিকে' 'দূরের পথিকচিত্তে'র উল্লেখ এসেছে অন্য বক্তব্যের সূত্রে, সংক্ষেপে।

'প্রান্তিকে'র উপসংহার আড়াই ছত্রে।—'আজি মুক্তিমন্ত্র গায়/আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম, / সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।' 'শেষ সপ্তকে'র শেষে ৯টি পংক্তি। বড্ড খুলে বলে দেওয়া হচ্ছে—'তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে / দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।' এই অতি-রিক্ত বিবরণের পরে এল আগের কবিতার সহমরণের বধূর তুলনা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে—'সহমরণের বধূ / বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায় / মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে / নূতন চোখে / চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ' ভাষাভঙ্গিটি আঁটসাঁট আর ঋজু নয়।

তাহলে, মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্‌কালীন ভাবনায় যতই নূতনের উপলব্ধি হোক, তার প্রকাশ গম্ভীর ওজন-করা চলন আর গাঢ় কণ্ঠস্বর দাবি করে কি? যেমন আছে 'প্রান্তিকে'র কবিতায়? অন্তত আলোচ্য দুটি কবিতার বোধের জন্যে 'প্রান্তিকের অঙ্গ এবং ছন্দই যেন ছিল উপযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে 'শেষ সপ্তকে' যে 'স্বাদ' 'ভঙ্গি' 'অচিন্ত্যের ইঙ্গিত' আর 'আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযমে'র অস্তিত্ব বিষয়ে লিখেছিলেন, তার ভিতরে উপস্থিত কবিতায় কোথাও কোথাও স্বাদ আর ভঙ্গি আস্বাদ্য। কিন্তু 'অচিন্ত্যের ইঙ্গিত' বেড়ে উঠে বিবৃতি হতে চায় বলে, সার্বিক নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সংযমের শাসনে গদ্যছন্দের এই কবিতাও সুঠাম দেহ পেতে পারত হয়তো। কবিতার শুরুতে তার প্রখর পরিচয়ও আছে। পাণ্ডুলিপিতে বার কয় কাটাকুটি করলেও 'শেষ সপ্তকে'র কপি তৈরি করবার তাড়ায় এ কবিতা দরকারের চেয়ে বড়ো হয়ে পড়ল কি? তাঁরই ভাষায়, তাড়াহুড়োর চিঠির মতো?

'প্রান্তিকে'র কবিতাটির গঠনে ধ্বনিসংঘাত অনেক বেশি। বিশেষত রুদ্ধদলের সুষম বিন্যাস বিষাদভাব থেকে প্রসন্নতায় উত্তরণের সহায় হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের চাল ধ্বনির ঐ আড়ম্বর স্বতঃস্ফীকার করেছে। কিন্তু ঐ কবিতার ধাঁচের অলঙ্করণ দ্বিতীয় কবিতায় স্বচ্ছন্দ হয়নি। যেমন, 'নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে' ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল প্রথম কবিতায়, কিন্তু রূপান্তরে 'আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে' চরণের অনুপ্রাস

লঘু শোনাচ্ছে।

একই কবিতার কবিস্বীকৃত দুই রূপের ভিতরে আমরা তাহলে কি ভেদ পেলাম? বাক্‌ধ্বনি ব্যবহারের দিক থেকে তারতম্য নয়, তারতম্য দেখা দিয়েছে শব্দ নিঃশব্দের হিসেবে। সার্বিক অঙ্গ বিচারে দ্বিতীয় কবিতায় কিছু অতিরিক্ত কথা পাওয়া গেল, যার অধিক আবৃত্তিতে মন্ত্রবাণীর সংযমে হানি ঘটেছে। 'তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে/দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য'—অন্যসব উল্লেখসূত্রে আভাসে জানাই ছিল যথেষ্ট।

'প্রান্তিকে'র কবিতায় ভাষা আর ছন্দে বিষয়োচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমরা কবির আবেগের সঞ্চালন উপলব্ধি করি, অনুভব করি সংযমের শুদ্ধতা। মনে হয় না কবিতায় এমন কোনো বাণী ছিল—যা না-বলবার। অঙ্গ বিশ্লেষণ ক'রে কাব্যাত্মার অভিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে 'প্রান্তিকে'র কবিতায় আমরা যে সুমিত গতিবেগ পাই, 'শেষ সপ্তকে'র কবিতায় তা ষোলো আনা পাই না। সামগ্রিক বিবেচনায় বলতে হয়, কবির অন্তরের স্পন্দ 'প্রান্তিকে'র কাব্যআঙ্গিকেই স্বাভাবিক 'সৃষ্টি'র ছন্দ পেয়েছে। "শেষ সপ্তকে"র পাতা ভরাবার জন্যে 'নির্মাণে'র তাগিদ শেষ পর্যন্ত আত্মায় আর অঙ্গে পরস্পরলীন হয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকাজে কত পরিবর্তন শিল্পসঙ্গত হয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু সকল কবিতার এই ছন্দান্তরের ক্ষেত্রে সেই মান অর্জিত হল কি?

যে-বাণীর যে-ছন্দ, বিশেষ কবিতামন্ত্রের ক্ষেত্রে, তা কি সত্যিই অন্য ছন্দে বিন্যাস করে একই লক্ষ্যে পৌঁছুনো যায়? 'পত্রপুটে'র দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত "যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে" কবিতা (পৌষ ১৩৪৪) গদ্যছন্দে যে-বাণী আমাদের প্রাণে ধ্বনিত করে, "নবজাতক"-এর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বদ্ধ "বুদ্ধভক্তি" (৪ঠা জানুয়ারি ১৯৩৮) কি পারে সেই একইভাবে আমাদের প্রাণিত করতে? কবিতা দুটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি, তা থেকে ধরা পড়বে, কবিতার নিজস্ব একটি ছন্দই থাকতে পারে শুধু।

বুদ্ধভক্তি

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরো গরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

রচনাকাল—৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ —নবজাতক

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

রচনাকাল—পৌষ ১৩৪৪ —পত্রপুট

সাধুরীতির ভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও রুদ্ধদলের সংঘাত-মুখর সুষম মিলযুক্ত মাত্রাবৃত্তের ছাঁদে সাজানো 'বুদ্ধভক্তি'কে অপ্রধান পদ্য বললে ভুল হয় না। 'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে / সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে' বা 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল / ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুলে'র মতো শিশুতোষ ছন্দচর্চার নিদর্শনের ভাব কবিতাটির অঙ্গে প্রকট হয়ে বক্তব্য বিষয়ের ভীষণতাকে ধ্বনিঝঙ্কারের আড়ালে ঢেকে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে, "পত্রপুটে"র কবিতাটির কথ্যভাষা—মুখের কথার জোরে বক্তব্য বিষয়ের ভীষণতার সঙ্গে সুস্পষ্ট ধিক্কারের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। "নবজাতকে"র কবিতার ছন্দের মসৃণগতিতে পাচ্ছি কবিনিন্দিত সেই 'হু হু করে' চলবার 'বাঁধা ছন্দের' দোষ। গদ্যছন্দের 'সতর্ক' কাটা-কাটা উচ্চারণে তিরস্কার তীব্রতা পেয়েছে।

কবিতাদুটি বেশ কাছাকাছি সময়ে লেখা। "পত্রপুটে"র কবিতাটি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" নামে মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যা "প্রবাসী"তে ছাপা হয়। আর ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যা 'পরিচয়ে' ছাপা হয় 'বুদ্ধভক্তি'। অর্থাৎ পদ্যছন্দোবদ্ধ রূপটিই পরে ছাপা হয়েছে। গদ্যকাব্য-সংগ্রহ 'পত্রপুটে'র প্রথম প্রকাশ এই কবিতা রচনার ঢের আগে—১৩৪৩ সালে ২৫ বৈশাখে। ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'পত্রপুটে' 'সতেরো' নম্বর কবিতা হিসেবে ওটি ছাপা হয়। কিন্তু তার দু বছর পরে ১৩৪৭ সালের বৈশাখে "বুদ্ধভক্তি" কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ "নবজাতকে" স্থান দিলেন। অর্থাৎ এ-রূপটিকেও কবি মর্যাদা দিলেন! কিন্তু কেন? আমাদের বিচার বলছে "পত্রপুটে"র গদ্যছন্দেই কবিতাটি যথার্থ প্রাণস্পন্দিত হয়েছে।

দুই কবিতার তরতম বিষয়ে কবির মনেও প্রশ্ন এসেছিল, তার প্রমাণ "পরিচয়"-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে "বুদ্ধভক্তি" কবিতাটি প্রকাশের জন্য পাঠাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে বিচার পরিহারের জন্য ওকালতির সুর। ১৩৭৯ সালের সাহিত্যসংখ্যা "দেশ" (পৃ. ১৪৯) থেকে পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সঙ্কলন করি—'বোমা অর্ঘ্য দ্বারা জাপানী কর্তৃক বুদ্ধপূজার উপর একটি কবিতা লিখেছি, পরিচয়-এ প্রকাশ করবে আশা করে পাঠালুম—বলে রাখি এরই গদ্য রূপান্তর গেছে প্রবাসীতে। রাধা বড়ো না শ্যাম বড়ো এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। যদি বলো কেউ কারো চেয়ে কম নয় তা হলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হবে।'

এ দুই কবিতার তুলনায় একটি কথা পরিষ্কার হয় যে, কাব্যছন্দের আশ্রয়ই কবিতার জন্যে সঙ্গত—কোনো-কোনো মহলে প্রচলিত এমন কথা মোটেই প্রমাণসিদ্ধ নয়। আলোচ্য প্রসঙ্গে 'প্রান্তিকে'র ১৬ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে "শেষ সপ্তকে"র 'চৌত্রিশ' সংখ্যক কবিতার তুলনা মনে আসে। উভয় কাব্যের গ্রন্থ-পরিচয়ে "শেষ সপ্তকে"র কবিতাটি সমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সনেট। সমাসবদ্ধ পদ এবং রুদ্ধদল সংঘাতের প্রাচুর্যপূর্ণ গাঢ়বন্ধের রচনা। ১৬ সংখ্যক এই কবিতাটির বাচ্যার্থ আলোচনা ১৫নং কবিতা প্রসঙ্গে একবার এসেছে। "প্রান্তিকে"র ঐ কবিতাটির মতো এটিতেও কবির পরিচয় পথিক হিসেবে। পথিক এবং দ্রষ্টা। তবে দ্রষ্টা হিসেবে আপন সত্তাদর্শন নয়, জীবনের সত্যদর্শনের কঠিন অভিজ্ঞতার প্রকাশ। উপস্থিত কবিতায় শেষ দুই চরণে, আপন দুঃখ-সুখে অসীমের হৃৎস্পন্দনের অনুভব ঘোষণাতে জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আপনার সাযুজ্য ঘোষণা। অনিত্য জগতের অঙ্গ হয়েও অনশ্বর অসীমের সঙ্গে ঐকাত্ম্যের উপলব্ধি। ভাষায় চিত্রে ছন্দে বিরাটের সমুদ্ভাসকে, শেষে ব্যক্তির দর্পণে প্রতিফলিত করে দেখলেন কবি।

"শেষ সপ্তকে"র কবিতায়, গদ্যছন্দে কথ্যরীতিতে বক্তব্য বিন্যাস করা হল। কিছু-কিছু সমাসবদ্ধ পদ অবিকল চলে এল বাচ্যবিষয়ের গুরুত্বের টানে। ক্রিয়াপদের ব্যবহারেই এল প্রধান পার্থক্য। কথ্য-ভঙ্গিতে সংবদ্ধ ভাব খানিকটা কমেই আসে। পূর্ব কবিতার ছন্দের নিবিড় শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে চরণপাতে অবকাশ পাওয়া গেল কিছু। অথচ, কবির মন রইল 'সর্বদা সতর্ক', 'ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসনের' স্থলে 'আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযমে' ধ্যানস্থ।

ছত্রের নতুন বিন্যাসে কয়েকটি প্রসঙ্গ পেল স্বাতন্ত্র্য। কবিতার উপক্রমেই দ্রষ্টার আমিত্ব ঘোষিত হচ্ছে পূর্ণ বাক্যে—'পথিক আমি'। প্রথম কবিতায়, বজ্রাঘাতে যে-বিজয়নিশান 'অন্তর্হিত'—দ্বিতীয় কবিতায়, বজ্রাঘাত প্রহারে তা 'গেছে উড়ে'। 'গেছে উড়ে' আলাদা ছত্রে

বিন্যস্ত হয়ে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম কবিতার দীর্ঘ পংক্তির শেষে বলা 'বিরাট সম্মান' দ্বিতীয় কবিতার স্বতন্ত্র চরণে 'বিরাট অহংকার' রূপে প্রকট।

'প্রান্তিকে' বলা 'লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিন-রজনীর আশা'—'শেষ সপ্তকে' 'সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে' চরণে একই ক্রিয়াপদের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসে বেদনার তারে বারংবার আঘাত করছে। প্রতিটি বিষয়ে উচ্চারণ মমতাবোধে বিজড়িত।

দুই কবিতার শেষের উপলব্ধিতে পার্থক্য আছে। গদ্যছন্দস্পন্দিত কবিতায়, কবি আপন সুখ-দুঃখের তরঙ্গময় বক্ষে 'অসীমের হৃৎস্পন্দন' অনুভব করেছিলেন। গদ্যছন্দে, আপন 'হৃৎস্পন্দনে' অনুভব করছেন 'অসীমের স্তব্ধতা'। ছন্দবন্ধের প্রভেদের কারণেই কি প্রথম কবিতার 'স্পন্দনে'র অনুভূতি দ্বিতীয় কবিতায় 'স্তব্ধ' হল? প্রথম কবিতার ছন্দস্পন্দে আত্মীয়তা স্থাপনের সূত্রে যে আশা ধরে রাখবার চেষ্টা, দ্বিতীয় কবিতার গদ্যছাঁদ সে-আশার পথে না গিয়ে বাস্তব স্তব্ধতার বোধকেই অঙ্গীকার করছে?

দুটি প্রকাশভঙ্গির এই তুলনা কোনোটির ঘাটতি নির্দেশ করবার জন্য নয়। তার কোনো সুযোগ নেই। সব মিলিয়ে কবিতা দুটি হয়ে উঠেছে দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পদ্যবন্ধের কবিতাকে গদ্যছাঁদে সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সৃষ্টির খেলায় মেতেছিলেন—এইবারে তার সফলতার কাছে আমরা নত হই। কবির কথাতেই স্বীকার করতে হয় যে, ফরমায়েশি খেলায় (এ-ক্ষেত্রে কবির নিজেরই ফরমাশ) মোটরের এঞ্জিনটিকে বাইরে থেকে চালু করবার পর মোটর তার আপনগতি পেয়ে গেছে।[১৩] শিল্পী কবি সচেতন চেষ্টা নিয়ে কবিতার রূপান্তরণ শুরু করে, পুনর্বার বোধের গহনে বিচরণ করেই বুঝি একই ব্যাচার্থের আরেকটি সার্থক রূপ-সৃষ্টি করলেন। সিদ্ধ কবি ক্ষেত্রবিশেষে আদি প্রেরণার উৎসে পুনরায় অবগাহন করে এক কবিতাকে দ্বিতীয় সার্থক রূপ অর্পণ করতে পারেন, এ সিদ্ধান্ত এবার অনিবার্য হল।

এখন, উপরের সিদ্ধান্তের জনক কবিতা দুটি সন্নিবেশ করে প্রবন্ধ শেষ করব।

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের; অস্তহিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি, বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত, যে ধূলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধূলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু কবি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

—'প্রান্তিক'

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে।
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত,
সেই ধুলার পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধূলায় ফেলে চিহ্ন,
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।
দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,

যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।
এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

—'শেষ সপ্তক'

সূত্রনির্দেশ

১. উক্ত নির্দেশে 'পরিবর্তন ও সংযোজনে'র তালিকায় 'রূপ-রেখা'য় মুদ্রিত ২১নং পংক্তির বর্জনের প্রসঙ্গ ছাড় পড়েছে। 'আর ফিরবে না কোনো দিন' ছত্রটি কেটে দিয়ে সংযোজন করা হয়েছিল 'দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসে'। শেষপাঠে এই পংক্তির পদবিন্যাসেও পরিবর্তন করা হয়েছিল।

২. শ্রীকানাই সামন্তকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন। 'রূপ-রেখা'য় প্রকাশিত 'মূল্যশোধ' কবিতা, পাণ্ডুলিপিতে তার পাঠান্তর, আর 'শেষ সপ্তকে'র প্রথম কবিতার মধ্যে বাক্‌ধ্বনি ব্যবহারে সংখ্যাগত তেমন তারতম্য নেই। 'মূল্যশোধ' আর তার প্রথম পাঠ-ভেদে এ-বিষয়ে যাও-বা পার্থক্য আছে, অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রূপের সঙ্গে প্রথম রূপের ভেদ তার তার চেয়ে কমেছে। পাঠ তিনটি উদ্ধৃত করে, তারপরে ধ্বনি ব্যবহারের একটি তুলনাত্মক সারণি উপস্থাপন করেছি।

৩. গ্রন্থপরিচয়, কল্পনা।

৪. সম, পুঞ্জ, মেঘ, মূর্ছা, অসম্মানে, যেন, ভূমি, ক্ষীণশ্বাস, প্রাচীনতা, আঁখি, শূন্যে, হেন, শঙ্খ, চন্দন, চমকিত, অনির্বচনীয়, যেন, উজ্জ্বান, অকস্মাৎ, যেন, যেন, অজানিত, আচ্ছাদন, বিস্ময়, যেন, ভ্রমরের, দেহমন, ছিন্ন, সমস্তের, মাঝে, যেন, জীর্ণ, রজনীর, মিশায়ে, পশ্চিম, নামহীন, মাঝে, সংসার, সহমরণের, বধূসম।

৫. শঙ্খ ঘোষ, 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', পৃ. ২১১।

৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৩।

৭. 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', পৃ. ২১০।

৮. 'আমার কাব্যের গতি'—পুলিনবিহারী সেন অনুলিখিত। 'রবীন্দ্রজীবনী', চতুর্থ খণ্ড।

৯. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। 'রবীন্দ্রজীবনী', চতুর্থ খণ্ড।

১০. 'জীবনস্মৃতি'।

১১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা পত্র, চিঠিপত্র ৫, পত্র নং ৫৭।

১২. যেন, প্রথম, দর্শন, উজ্জ্বান, পৌঁছলেম, মুহূর্তেই, অন্ধযুগের, অজানা, সমস্তের, মাঝে, জনশ্রুতির, জীর্ণ, অনির্বচনীয়তায়, পর্যন্ত, সামনে, প্রথম, চঞ্চল, যেন, ভ্রমণ, আধুনিকের, ছিন্নতার, ফাঁকে ফাঁকে, সহমরণের, ছিন্ন।

১৩. 'মহুয়া' কাব্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা

ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। মনসুর মুসা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঁচিশ টাকা।

বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন। আহমদ শরীফ। বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা। কুড়ি টাকা।

ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা (১৯৭০-৮৫) ইসরাইল খান। অক্ষর, ঢাকা। তিরিশ টাকা।

আমাদের আলোচ্য তিনটি বইয়ের মধ্যে মনসুর মুসার 'ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব' বইটি বেরিয়েছে ১৯৮৫-র ফেব্রুয়ারিতে। বাকি দুটি, আহমদ শরীফের 'বাংলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন' এবং ইসরায়েল খানের 'ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা' (১৯৭০-১৯৮৫) বেরিয়েছে ১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসটি বইপত্র প্রকাশের, বিশেষত বাঙলাভাষা সংক্রান্ত বইপত্র প্রকাশের এক পরব-পার্বণ নিয়ে আসে।

চরিত্রের দিক থেকে মনসুর মুসার বইটি একটু অ্যাকাডেমিক, মূলত পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে পরিকল্পিত। এ বইটির মূল্য এখানেই যে, এ বইটি পড়ে নিলে বাকি দুটি বই পড়বার একটি পটভূমিকা তৈরি হয়, সে দুটি বইয়ের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা প্রতিষ্ঠানগত ধারণা, প্রস্তাব ও কার্যাবলির বিচার করবার কিছু মাত্রা আমরা পেয়ে যাই। "রচনা-পঞ্জী" ও "নির্ঘণ্ট" ছাড়াও মুসার বইয়ের মোট আটটি অধ্যায় আছে। তাতে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে "ভূমিকা ও সংজ্ঞা", "ভাষা-পরিকল্পনার কথা", "ভাষা-সমস্যা ও পরিকল্পনা", "ভাষা-সম্প্রদায়", "মানব-বিকাশ ও ভাষা-পরিচর্যা", "ভাষাদর্শ", "ভাষা-পরিকল্পনা সংস্থা" এবং " উপসংহার" ।

পাঠ্য বইয়ের সংক্ষিপ্ত আকারের চাপে কিনা জানি না, মুসার আলোচনায় প্রচুর তথ্য ও সংবাদ থাকলেও তার পরিবেষণ স্বচ্ছন্দ নয়, ভাষা একটু ক্লিষ্ট। অসংখ্য ভাষার ও ছাপার ভুল (বাংলা একাডেমীর কাছেও কি এত মুদ্রণ-প্রমাদ প্রাপ্য হবে আমাদের ?) পাঠককে আরো খানিকটা দমিয়ে দেয়। মুসা একটু ছেলেমানুষও আছেন। ফলে বইটি লেখার মূল প্রেরণা যে

গ্রন্থসমালোচনা

তিনি বিদেশে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পেয়েছিলেন একথা জানানোর লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। হনোলুলুর ঈস্ট-ওয়েস্ট সেনটারে তিনি গবেষণা করেছেন, কিন্তু এদিকে বাঙালির বোধে "হনোলুলু-কামস্কাট্কা" বিষয়ে উপহাস্যতার স্মৃতি আছে বলে সে শহরের নামটি তিনি করেন না, তিনি বরং সে শহর যে দ্বীপে অবস্থিত সেই ওয়াহো দ্বীপের নাম করে বলেছেন "সেখানকার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কেন্দ্রে অন্তরীণাবদ্ধ (Research Intern) ছিলাম দেড় বছর।" কলামবিয়া ইয়ুনিভারসিটি যে নিউইয়র্কে—সেটা না বলে, ম্যানহাটান দ্বীপে বলার মতো এই ছেলেমানুষি।

মুসা অবশ্য সমালোচকের কাজ সহজ করে দিয়েছেন নিজেই নিজের লেখার সমালোচনা করে। "নিবেদন"-এ[নয়] পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত ছিলো কোনো কোনো অংশের, সংহত হওয়া উচিত ছিলো কোনো কোনো অংশ, আরো নিটোল হওয়া উচিত ছিলো ব্যাখ্যা, আরো গভীর হওয়া উচিত ছিলো পরিচর্যা ; উচিত ছিলো বানান পদ্ধতি নির্ভুল হওয়া, প্রয়োজন ছিলো টীকা-ভাষ্য সংযোজনের।" এত সব নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর কথা যিনি নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজেই বলেন তাঁর লেখার সমালোচনা করতে সংকোচ বোধ করি। তবু সমালোচকের স্বেচ্ছাবৃত তিক্ত দায় থেকে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন উঠবে তাঁর কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা নিয়ে। যেমন—" 'ভাষা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তিত হয় ; এ পরিবর্তনে মানুষের করণীয় কিছু নেই'—উনবিংশ শতাব্দীর এ ধারণা এখন ভাষাতত্ত্বে অচল।" তিনি একটি বাক্যে কথাটা সেরে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কোন্ অর্থে, কতটা এবং কী ভাবে অচল তা বলেন নি। এসব পরিনির্দেশের প্রয়োজন ছিল—কারণ এটা এক কথার বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত 'ভাষা পরিকল্পনা' এই নামটির মধ্যে বহুভাষী রাজ্যে রাষ্ট্রীয়, জাতীয় বা সরকারি ভাষা নির্ধারণ—যেটা মূলত choice বা নির্বাচনের সমস্যা—এবং তার থেকে পৃথকভাবে ভাষার মানোন্নয়ন (স্ট্যানডার্ডাইজেশন)—যেটা মূলত একটিমাত্র ভাষার বা উপভাষার সংস্কার ও সংবর্ধনের সমস্যা—এ দুটি ধারণাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। কেন তা করেছেন জানি না। সম্ভবত রুবিন ও লেখকের গুরু

বিঅর্ন ইয়ার্নুডের planned action on language কথাটির মধ্যে এ দুটি ধারণার মিশ্রণ আছে বলেই। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে এই দুটি ধারণা পরম্পরাবদ্ধ, কিন্তু এক নয়। তাঁর আর-একটি উক্তি "কেউ কেউ বলেছেন নতুন নতুন জাতীয় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্ন আধুনিক ভাষাতত্ত্ব মীমাংসা করতে পারে নি। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ব্যর্থতা থেকেই ভাষা-পরিকল্পনার সূত্রপাত।" এটি অবশ্য এস. তকদির আলিসইয়াবানা-র একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি। কিন্তু কথাটিকে মুসা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করলেন কেন সেটাই জিজ্ঞাস্য। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব যে-ভাবে উদ্ভূত এবং বিবর্তিত হয়েছে, তুলনামূলক-ঐতিহাসিক থেকে বাইনডিং আর গভার্নমেনট পর্যন্ত—তাতে কি কোথাও তৃতীয় বা কোনো বিশ্বের ভাষা-সমস্যা সমাধানের দায় সে তুলে নিয়েছিল ? তার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। প্রথমে সে খোঁজ করেছে ভাষার বিবর্তনের তথ্য ও সাধারণ নিয়ম, তারপর সে জানতে চেয়েছে নানা ভাষার সংগঠনের মূল ভিত্তি ও নিয়মাবলি, এখন সে ধরতে চাইছে মানবভাষার সংগঠনের মূল রহস্যকে। সে ছিল থিয়োরি নিয়ে ব্যস্ত, প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এটা আধুনিক ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্যগত সংকীর্ণতা হতে পারে, কিন্তু এক কথায় "ব্যর্থতা" কেন বলব ? বিদেশী পণ্ডিত বিদেশী ভাষায় একটা ফতোয়া জারি করলেই আমাদের বিনা মন্তব্যে সেটা মেনে নিতে হবে ?

লক্ষ করি ৯-১০ পৃষ্ঠার বিবৃতি। উন্নয়নকামী দেশগুলির ভাষা-পরিকল্পনা ইয়োরোপীয় দেশগুলির উদ্যোগ থেকে ভিন্ন রকমের—এটা তিনি বুঝেছেন। পাশ্চাত্যের পদক্ষেপ নাকি পণ্ডিতেরা বলেন "cultivation approach" বা পরিচর্যার পদক্ষেপ—অর্থাৎ সেটা ধীর প্রক্রিয়ায় চলেছে—সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার ক্রমপরিচর্যার মাধ্যমে। আর উন্নয়নকামী দেশগুলিতে "সমস্যা জরুরী" এবং "এর সমাধানও চাওয়া হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে।" অর্থাৎ ইয়োরোপ বনাম তৃতীয় বিশ্ব—ভাষা-পরিকল্পনার চরিত্রে একটা বিপ্রতীপতা তিনি লক্ষ করেছেন বা পণ্ডিতদের বই পড়ে বুঝে নিয়েছেন।

এখন সমস্যা হল, প্রথম-মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সোবিয়েত ইয়ুনিয়নের ভাষা-পরিকল্পনাকে তিনি পাশ্চাত্ত্যের মডেলে ফেলবেন, না উন্নয়নকামী দেশের মডেলে ফেলবেন ? সোবিয়েত দেশের খানিকটা ইয়োরোপে, এবং তা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশও ছিল না। তবু লেনিনের নেতৃত্বে সে দেশের ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষার মানোন্নয়নে এমন একটা তীব্র গতির সঞ্চার হয়েছিল—প্রথমে রোমক লিপিতে অলিখিত ভাষাগুলিকে লিখে ফেলা (তথাকথিত ল্যাটিনাইজেশন), তারপর সেগুলিতে চূড়ান্তভাবে রুশ লিপির আরোপ (রাসিফিকেশন)—ইত্যাদি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কত দ্রুত রুশদেশে ভাষা-পরিকল্পনা এগিয়েছিল তা ইসায়েফ প্রভৃতির বই পড়লেই জানা যায়। এখানে তো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের পরিষ্কার ধীর-দ্রুত বৈপরীত্যের ছক খাটল না। সেটা তো মুসাকে লক্ষ করতে হবে।

এ বইয়ে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কখনো কখনো খুব বেশি, এবং নিরর্থক, কথা বলা হয়েছে। যেমন 'সমস্যা' কী—এই নিয়েই একটি অংশ (১১ পৃ) যার শুরু এই ভাবে—"সমস্যা বলতে বোঝায় একধরনের পরিস্থিতি যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া দুঃসাধ্য হয়"। পাশ্চাত্ত্যের একদল গবেষক এই ধরনের 'বৈজ্ঞানিকতা'—ইংরেজিতে যাকে বিদ্রূপ করে scientism বলা হয়—তার ভড়ং করেন কিন্তু আমরা কেন সে খপ্পরে পড়ব ? সোজাসুজি ভাষা-সমস্যার সংজ্ঞা দিলে কী হত ? আরেক জায়গায় (৫৮-৫৯) "উচ্চারণ কি ?" নাম দিয়ে তিনি প্রায় এক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন,—যার কোনো দরকার ছিল বলে বোধ হয় না। এই অংশে কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণ খবরও আছে। যেমন মুসা বলছেন, বাঙলা উচ্চারণতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে সর্বসাকুল্যে দুখানা; আবদুল হাইর গবেষণা নাসিক্য ধ্বনি' সম্পর্কিত; আরকষ্টিক ও দাস (১৯৭২) করেছেন সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের ওপর।" (৬০ পৃ.)। কিন্তু তাঁর আবদুল হাই-র 'বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' বা সুনীতিকুমারের প্রবন্ধ "Bengali Phonetics (১৯২১)-এর কথা মনে পড়ল না কেন ? শুদ্ধ মূল স্বরধ্বনি বাঙলায় কটা তাও নাকি মুসার জানা নেই, কারণ সুনীতিকুমার, ফারগুসন, মুনীর চৌধুরী বলেন সাতটি (সুনীতিকুমার আগে কিন্তু বলতেন আটটি), আর হাই বলেন আটটি। এ নিয়ে মুসা এতই উদ্বিগ্ন যে, ওঁর আতঙ্ক প্রায় অতিনাটকীয় চেহারা পায়—"স্বরধ্বনি যদি সাতটি হয় তবে, নাসিক্য ধ্বনি অর্থাৎ অনুনাসিক স্বরধ্বনিও হবে সাতটি", আটটি হলে হবে আটটি। "এবং সেভাবেই দ্বিস্বরধ্বনির জোড়া সৃষ্টি হবে এবং সেভাবেই অর্ধস্বরধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হবে।" একটানা কথার তোড়ে তিনি এসব বলে যান বটে, কিন্তু আসল সমস্যাটা

বিশ্লেষণ করতে না-চাওয়াই এখানে তাঁর বেশি ফুটে ওঠে যেন।

আসল সমস্যাটা এত ভয়ংকর কিছু নয়। হাই প্রভৃতি যে-একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির অনুমান করেন, সেটি স্বরসংগতি-জাত 'ও'। এখন যে-কোনো গবেষকই বলবেন ওটি ফোনিম নয়, অ্যালোফোন—এবং তাই ওটিকে আলাদা দেখানোর অর্থ হয় না। সাতটিই আমাদের স্বরধ্বনি। আনুনাসিক স্বরধ্বনিও তাই সাতটি—কিন্তু আনুনাসিক স্বরধ্বনি ফোনিম নয়, এ সম্বন্ধে ধ্বনিতত্ত্বের সম্ভতন বিশ্লেষণ বলে যে তা মূলত স্বর+নাসিক্যব্যঞ্জন এই পরম্পরার পরিণাম। আর এদের সংখ্যার উপর অর্ধস্বরের সংখ্যার কি কোনো নির্ভরতা আছে? সাতটি হোক, আটটি হোক—অর্ধস্বর বাঙলায় চারটি—ই়, উ়, এ় (য়) এবং ও়।

এই প্রসঙ্গেই মুসা এনেছেন উপভাষার কথা। উচ্চারণ-আদর্শ তৈরি করতে উপভাষার কথা উঠবে কেন? মান্য ভাষার উচ্চারণে যদি সংশয় বা বিকল্প থাকে, যেমন নমস্কার (নোমোশ্‌কার, নমোশ্‌কার) সেইটে আগে অবিকল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিংবা দুটিই মেনে নেওয়া দরকার। প্রত্যেক ভাষাতেই বহু শব্দের একাধিক উচ্চারণ আছে, ইংরেজিতে often ইত্যাদির যেমন। উপভাষার উচ্চারণ থেকে মান্য উচ্চারণ শেখার সমস্যাটা নিশ্চয়ই আছে, সে তো সব ভাষাতেই আছে। সেখানে শুধু Lowering এবং 'Highering' (কথাটা heightening হবে না? Highering তো শুনিনি)-এর কথা উঠবে কেন? মুসা যেরকম নিরুত্তমী ও নেতিবাচক কথা বলেন, যেমন "অন্ধকারে কালো বিড়াল অনুসন্ধানের মতো", "ধূম্রজালের অবস্থা"—বাঙলা উচ্চারণতত্ত্বের আলোচনার অবস্থা সত্যিই কি অত খারাপ?

বইটির পরিকল্পনা করা উচিত ছিল অন্যভাবে। প্রথমে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন এলাকার একটি পরিষ্কার মানচিত্র তৈরি করে নেওয়ার দরকার ছিল, কারণ সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারণাটাই বাঙালি শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট নয়, যদিও পশ্চিমবাঙলার তুলনায় বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে আলোচনা তুলনায় কিছু বেশি হয়েছে। ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ভাগ করেছেন—বর্ণনাত্মক (descriptive), সচল (dynamic) এবং প্রয়োগমূলক (applied)—এবং এ ভাগও চোখ বুজে মেনে নেওয়ার মতো নয়, কারণ সচল ও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনেক সময় প্রক্রিয়া হিসেবে মিশে যায়। তবু ভাষা-পরিকল্পনা যে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের অংশ—তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে তারপর তাতে পৌঁছানো উচিত ছিল। ফলে মুসার বইয়ে একটা সংগত ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার ছবি ফুটে ওঠে না। যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভাষা-সম্প্রদায়' অংশে। এখানে ভাষা-সম্প্রদায়ের বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় নি। ভাষাগত ঐক্যের বোধ উপভাষী থেকে আরম্ভ করে এসপেরান্তোর মতো আন্তর্জাতিক সহায়ক কোনো ভাষার (International auxiliary language) ব্যবহারকারীদেরও থাকতে পারে—এর সম্পূর্ণ মাত্রা মুসার আলোচনায় আভাসিত হয় নি। 'মানববিকাশ ও ভাষা-পরিচর্যা'; 'ভাষাদর্শ' ইত্যাদি বিভাগগুলিকেও ভ্রুত-বিন্যস্ত মনে হয়, ভাষা-পরিকল্পনার সঙ্গে তাদের আবশ্যিক যোগটি স্পষ্ট করা হয় নি, অন্যদিকে কিছু পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। 'ভাষা-পরিকল্পনা সংস্থা' অধ্যায়ে "ইউরোপীয় ভাষা-সংস্কার উদ্ভব" অংশটি আগে আসা উচিত ছিল, পরে কালানুক্রমিকভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টার কথা। একটি অধ্যায়ে ভাষা-উন্নয়নে কিছু অতীব মূল্যবান ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা বললে ভালো হত, যেমন পাণিনি, ডঃ স্যামুয়েল জনসন, ওয়েবস্টার ইত্যাদির কথা—শেষের দুজন মুসার উল্লেখেও আসেন নি। মুসার দৃষ্টি অতিরিক্ত পশ্চিমঘেঁষা, এবং ব্যক্তি ও সংস্থার বাইরে আন্দোলনের মধ্য দিয়েও যে ভাষা-উন্নয়ন বা স্ট্যানডার্ডাইজেশন হতে পারে, সেটা লক্ষ করে চীনের চৌঠা মে আন্দোলনের কথা বলা উচিত ছিল, তাও তে ৎ সুং-এর চমৎকার বই আছে সে বিষয়ে। এই অধ্যায়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তুলনায় সারস্বত সমাজের ইতিবৃত্ত যে গুরুত্ব লাভ করেছে তা তার পাওয়ার কথা নয়। অ্যাকাডেমিগুলির ইতিবৃত্ত সেজন্য খুবই অসম্পূর্ণ; ফরাসি আকাদেমির কথা এলই না আলোচনায়, এবং ইংলনডে অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াসের কথাও বলা হল না।

বইটির ভাষারীতির ক্লিষ্টতার কথা আগে বলেছি। "অবদান রাখার প্রয়াস পাচ্ছেন," "রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস পাচ্ছি" এ ধরনের প্রয়োগে স্বাচ্ছন্দ্য কম। মুসার পরিভাষাও আপত্তিকর। Reissuance-এর বাঙলা "পুনরোক্তিকরণ" ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ নয়, হবে পুনরুক্তিকরণ—'পুনঃ+উক্তি সন্ধি মেনে। Binary-র বাঙলা "দ্বৈত" হওয়া উচিত নয়, 'দ্বি-কল্পিক' বা 'দ্বিসম্ভব' হতে পারে। ৫৫ পৃষ্ঠায় "ঐক্যবোধতাও" কথাটি—ছাপার ভুল না হলে ব্যাকরণ ভুল। উচ্চারণের প্রতিবর্ণীকরণে বহু অসংগতি, দেখি—ভাইনরাখ কখনও ভাইনরাইখ (৩১), কখনও ওয়াইনরাইখ (৫)। ওয়াইনস্টাইনকে আবার ভাইনস্টাইন করতে তাঁর দ্বিধা হয় নি (২)।

যিনি একজন তরুণ ও পরিশ্রমী গবেষক, দেশ-বিদেশের জ্ঞানের প্রতি যাঁর উন্মুখতা আছে, তিনি কেন এমন অসতর্ক ও শৃঙ্খলাহীন হবেন, সেটা ভেবেই বিস্ময় জাগে। তাঁর বিষয়টি গরিব ভাষা-সমস্যাকণ্টকিত দেশের পক্ষে খুব জরুরি এবং তাঁর রাস্তায় কাজ করবার যোগ্য লোকও খুব বেশি নেই। এরকম একটি বই সেজন্য খুব প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ঠিক যে-আকারে ও যে সম্বল নিয়ে বইটি আমাদের হাতে এল তা আমাদের পুরো সন্তুষ্ট করতে পারল না—এই খুব দুঃখের কথা। আর বাংলা একাডেমীকে বলি, যে-সংস্থা সমস্ত বাঙালির গর্ব ও গৌরব, আমরা পশ্চিমবাঙলার অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন ভাষাজিজ্ঞাসুরা যে-প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অহংকার করি, সে প্রতিষ্ঠান এমন অযত্নে, এত মুদ্রণ-প্রমাদ সহ বই ছাপছেন—এতে বাঙলাভাষার প্রতি কোন্ ভালোবাসার প্রমাণ হয়? বছরে একশোটা বই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে কি বার করতেই হবে? এইভাবে?

মনসুর মুসার বইটির আমরা একটু বেশি জায়গা নিয়ে আলোচনা করলাম, তার কারণ বইটি একটি নতুন বিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছে। সেখানেই, অসম্পূর্ণ হলেও, বইটির একটি মূল্য তৈরি হয়েছে। আহমদ শরীফের বইটি এ ধরনের নয়, কিন্তু তারও মূল্য এখানে যে, সে বই করতে চেয়েছে ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটন। সে কোন্ ইতিহাস? সে ইতিহাস বাংলাদেশের কেন, সমগ্র বাঙলাভাষীদের বিশেষ মমতার ইতিহাস।—ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস। বইটি অসাধারণ চিত্তাকর্ষক, প্রায় গোয়েন্দা-কাহিনীর মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলবার যোগ্য। বাঙলা ভাষা সংস্কার-আন্দোলনে শাসক ও শাসক-তোষা বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, সে ভূমিকায় কোন পক্ষের কে কখন কোন্ ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন, বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ষড়্‌যন্ত্রের প্রস্তুতি হিসেবে কীভাবে প্রথম থেকে বাঙলা ভাষার 'দুর্বলতা'র নানা দিক তুলে ধরে তার 'সংস্কারের' বহুবিধ প্রস্তাব উঠে আসছিল—এ সবই চমৎকার বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক শরীফ। এর সমালোচনা কী করার আছে জানিনা, হয়তো retrospection আকারে না এসে সমকালীন বিতর্ক হিসেবে লেখাটি রচিত হয় নি, সেটিই একমাত্র সমালোচনা। কিন্তু শরীফ সাহেবের বেশ কিছু মন্তব্যের উদ্ধৃতি থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন বিলম্বিত হলেও বাংলাদেশী জাতীয়তার যথার্থ ভিত্তির অনুসন্ধানে এ বই কত জরুরি ছিল। যেমন

১. ভাষা ও বানান সংশোধনের সমস্যা—"সরকারী অভিসন্ধিজাত একটা বানানো সমস্যা" (পৃ. ২)

২. "ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রভাবে মুসলিমেরা দেশকালহীন এক মানসজগতে কেবল স্বধর্মীয় বৈশ্বিক সমাজে বাস করে। ফলে তারা থাকে স্বদেশেও প্রবাসী—যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তা তার সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সে মনের মধ্যে আপন বলে গ্রহণ করে না। তাই বাস্তব-অবাস্তবের দ্বৈত বা দ্বৈধ সত্তায় (Split personality) বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বে ভোগে" (৯)।

৩. "১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সন অবধি ত্রিশটি বছর ধরে বাঙালী মুসলমান ভাষা বিষয়ে কি অস্বচ্ছ ও অসুস্থ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন"…(১৬)… "আমাদের বিদ্বিষ্ট মনের ও অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় গ্রহণ করছে আমাদের ভাষা-সংস্কার আন্দোলন"…(১৭)।

৪. "বর্ণ-বানান-ভাষা সংস্কার আন্দোলন যেহেতু সদিচ্ছা-সদ্‌বুদ্ধিজাত ছিল না, ছিল না স্বচ্ছ ও সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ, কেবল হিন্দু ও হিন্দুয়ানী-বিদ্বেষ এবং করাচিওয়ালাদের শাসন-শোষণ কায়েম রাখার অপবুদ্ধিই ছিল এ অপকৌশল গ্রহণের মূলে, সেহেতু এ নিষ্ফল আন্দোলন কয়েক বছর পরেই বৃথা ও ব্যর্থ বলে পরিত্যক্ত হল" (২০)।

এ গ্রন্থ, আসলে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ—ছত্রে-ছত্রে এইরকম স্পষ্টভাষণে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আহমদ শরীফের অন্যান্য রচনায় তাঁকে যেমন স্থিতধী ও অনাসক্ত অবস্থান নিতে দেখা যায়, এ প্রবন্ধে তিনি মোটেই সেরকম নন। এখানে তিনি ক্রুদ্ধ, ক্ষমাহীন ও আঘাতপ্রবণ। তবু তাঁকে একটি কথা স্থিরভাবে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। সংস্কার দুরভিসন্ধি-প্রসূত হলেও একেবারে তার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়াও হয়তো ঠিক নয়। আমরা তাঁর সমস্ত যুক্তিই মানি

যে, গণশিক্ষায় সত্যাকার সংগঠন ও আগ্রহ যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে বাঙলাভাষার বানানপদ্ধতি বা বর্ণমালা, পরিভাষার অভাব—এসব কোনো অসুবিধাই থাকবে না, কারণ ইংরেজি বা ফরাসি ভাষার 'আপেক্ষিক' সুবিধা বাঙলার চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়। তাঁর এ পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্ন অতিশয় সংগত যে "য়ুরোপীয় কোন ভাষাতেই শব্দের বানান ও উচ্চারণ অভিন্ন নয়। তবু য়ুরোপে কি সাক্ষরতা ও গণশিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করে নি? হরফ কমালে কি মানুষের মনীষা সৃজনক্ষমতা বাড়ে? ভাষার বর্ণ শব্দ ও লিখনভঙ্গি বদলালেই কি দেশ অর্থে সম্পদে শিল্পে বাণিজ্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠবে?' (১৫ পৃ.)। তবু স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত সংস্কারের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

একটু আগে আমরা শরীফ সাহেবকে খোঁচা দিয়েছি যে, তাঁর প্রবন্ধটির প্রকাশ প্রাসঙ্গিক সময়ের থেকে বিলম্বিত, তা retrospection। ভালো হল যে লেখাটি শেষ করার আগেই আমাদের ভ্রান্তি স্বীকারের ও সংশোধনের সুযোগ পাওয়া গেল। বাংলা ভাষাকে "মুসলিম ঘরান"-রূপে দেখার ইচ্ছে এখনও বাংলাদেশে আছে, যেমন লক্ষ করি 'অংগীকার' (ভাষা-দিবস সংখ্যা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) পত্রে "ভাষা বনাম জাতিসত্তা" নিবন্ধে আবদুল মান্নান তালিবের উক্তি—"যে ভাষা আমাদের স্বাধীন সত্তার ভিত রচনা করেছে বলে আমরা দাবী করি, সে ভাষাই যদি তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে না পারে, সে ভাষাই যদি বিদেশের ও বিজাতির আদর্শ ও ভাবধারার বাহন হয়, তাহলে আমাদের স্বাধীন সত্তা টিকে থাকবে কিভাবে? তাহলে আমাদের স্বাধীন সত্তার বিকাশ কিভাবে সম্ভবপর? এভাবে আমাদের স্বাধীনতা কি আমরা বিদেশ ও বিজাতির কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি না?"

ফলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে যে, শরীফ সাহেবের বইটি শুধু ইতিহাসের পর্যালোচনা নয়, তা সমসাময়িকতার অন্তর্গত, বিতর্কে ও সত্যভাষণে সজীব ও উত্তেজক।

কুড়ি পৃষ্ঠার নিবন্ধ, কিন্তু বাকি চৌষট্টি পৃষ্ঠায় বর্ণ ও বানান সংস্কারের বিভিন্ন ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব তুলে দেওয়া হয়েছে, তার মূল্যও কম নয়।

ইসরাইল খানের বইটি অবশ্য একেবারে হাল সময়কে নিয়ে, ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত এর বিবেচনার বিস্তার। এই পনেরো বছরে বাঙলা ভাষার পক্ষে ইংরেজি ভাষার বিপক্ষে ও পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের যে তর্ক-বিতর্ক চলেছে তার দলিল তুলে ধরেছেন খান সাহেব, এবং সেই সঙ্গে এরশাদ সরকারের ভূমিকাকেও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। খানের মূল দুঃখের উৎস ভাষা নয়। তাঁর মতে ভাষা-আন্দোলন শুধুই ভাষা-আন্দোলন ছিল না, তা ছিল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উত্থানের আন্দোলন। দুর্ভাগ্য এই যে, কালক্রমে তা শুধুই ভাষা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ল, এবং মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নতির লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবলমাত্র একুশের আনন্দোৎসব ও পরব-পার্বণের বা ছুটির দিনের চেহারা নিল। আবুল কাসেম ফজলুল হকের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এই প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরেন—"গত পনের বছরের বিভিন্ন গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের লোকসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে বারবার যে দাবীটি উত্থিত হয়েছে তা-হল সমাজব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সাধন এবং অন্যায়মুক্ত, অবিচারমুক্ত, নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সাধন। জনগণের কাছে সেই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে বহুবার—কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যেন প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কি বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে না?" খানের মতে ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির লব্ধ চেতনা ছিল এই সার্বিক উজ্জীবনের, তা কেবল ভাষা-সংস্কারের আন্দোলনে-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হওয়ায় আন্দোলনের বিচ্যুতি ঘটেছে।

'সর্বস্তরে' বাঙলা ভাষা প্রচারের দাবিটির অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ করেছেন খান। তাঁর মতে গণশিক্ষার প্রচার না হলে এ দাবি অর্থহীন, আর আসল দাবি হওয়া উচিত 'উচ্চস্তরে বাঙলা ভাষার প্রচলন, তার কারণ একশ্রেণীর আমলারাই ইংরেজি বা এখন আরবির একটি কায়েমি মৌরসিপাট্টা জীইয়ে রাখছে। এই সূত্রে যাঁরা বাঙলা ভাষার নামে ইদানীং সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন তাঁদের পরিবারও সন্তানসন্ততিদের পাশ্চাত্যমুখিতার কথাও উল্লেখ করেছেন খান, দেখিয়েছেন একটা ভণ্ডামির খেলা কোথাও চলছে। ফলে খানের তিক্ত সিদ্ধান্ত—"আমরা মনে করি, বাঙলা লিপি, বানান ও ভাষা সংস্কার বিষয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই মঙ্গল। কাদা ঘাঁটলে প্রায়ই কর্দমাক্ত হতে হয়; ছাই ঘেঁটে মুক্তা আবিষ্কার করার সাধ্য সকলের থাকে না।" (পৃ ৯২)। শরীফ সাহেবের মতোই খান সাহেবেরও মত, "দু-চার জন ব্যতীত কোন সংস্কারকই প্রকৃতপক্ষে বাঙলার ও বাঙালীর মঙ্গল ও উন্নতিকামী ছিলেন না।"···এখন তাই এই ভাষাব্যবসায়ীদের ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। খান সাহেবের ব্যাকুলতা শুধু বাঙলা নিয়ে নয়, বাঙালি জনসাধারণকে নিয়ে। ভাষাবিতর্কের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই ব্যাকুলতাকে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

তাঁর গ্রন্থটিতে কোনো চাতুর্য বা ভান নেই, উদ্ধৃতির আধিক্য কখনো-কখনো বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করে। তবু বিভিন্ন শিরোনামের নীচে প্রসঙ্গকে সাজিয়ে অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি ভাষাগত তর্ক-বিতর্ক-প্রস্তাব-প্রয়াসের ছবিটি তৈরি করেছেন এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংকটকে দেখিয়ে দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশী জনসাধারণের স্বার্থের বিষয়টি আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে এনেছেন।

পবিত্র সরকার

ভাসানী ও 'ত্যাগী চিন্তাবিদ'

ভাসানী—প্রথম খণ্ড। সৈয়দ আবুল মাহমুদ। ঢাকা, ১৯৮৬। একশ পঞ্চাশ টাকা।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক—বদরুদ্দীন উমর। মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫। আটত্রিশ টাকা।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন, কর্মকাণ্ড, রাজনীতি এবং দর্শন সম্বন্ধে বিশদ বিশ্লেষণ তথা তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছে। এ্যাপারে সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

১৯২০-র দশক থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষকে শোষণমুক্ত করার জন্য পূর্ববঙ্গে আর আসামে বারবার আন্দোলন করে ভাসানী স্মরণীয় হয়েছেন। ওই সময়ে জননেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য প্রায় তর্কাতীত। অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে জমিদার আর মহাজনদের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র। ওই সময়ে ভাসানীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ৫২৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থে যে-ধরনের বিশদ বিবরণ-বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব ছিল, সেটা কিন্তু মকসুদ দেন নি। প্রধানত সৈয়দ মুর্তাজা আলী আর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মূল্যবান গ্রন্থগুলি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েই এই কর্তব্য তিনি সমাপ্ত করেছেন।

১৯৪৭-উত্তর যুগে ভাসানীর ভূমিকা আলোচ্য গ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু এই অংশেও লেখক ভাসানীর বক্তৃতা-বিবৃতিগুলির পুরোপুরি এবং বারবার উদ্ধৃতি দেওয়ায় মূল বিবরণ-বিশ্লেষণ ব্যাহত হয়েছে, এবং অনেক সময়েই পাঠকের মনে একটি ধারণা জন্মাতে পারে যে বিশ্লেষণের চেয়ে লেখকের কাছে স্তুতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওইসব অভিভাষণ-বিবৃতি পরিশিষ্টে দিয়ে পুস্তকের মূল অংশে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) ভাসানীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনা যে-কোনো পাঠকের কাছে অধিকতর কাম্য হত। প্রসঙ্গত, ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে দুই-একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে—যে প্রশ্নগুলির সদুত্তর মকসুদ দেবার চেষ্টা করেন নি। পূর্ব পাকিস্তানকে মুসলিম লীগ দলের অপশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এবং যুক্ত ফ্রন্টকে পঞ্চাশের দশকে ক্ষমতাসীন করার জন্য ভাসান চমকপ্রদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু যে সরকার তাঁরই সমর্থনের ফলে ক্ষমতায় আরোহণ করে, তাকে—অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সরকারকে—ভাসানী রচনাত্মক কাজ মারফত শক্তিশালী না করে নেতিমূলক আর দায়িত্বহীন সমালোচনা দ্বারা বিপাকে ফেলেন। **ওজারতির দুই বছর** গ্রন্থে আতাউর এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আতাউর-এর অনুযোগের জবাবে ভাসানী বলেছিলেন, "আমি প্রকৃতিগত বিরোধীভাবাপন্ন।" কিন্তু এই মন্তব্য আমাদের আর-একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যদিও আয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ভাসানী ষাটের দশকের শেষে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার আগে প্রায় দশ বছর কোন্ যুক্তিতে আয়ুবের সামরিক

একনায়কত্বের বিরোধিতা থেকে ভাসানী বিরত ছিলেন? **পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর** গ্রন্থে ভাসানীকে বাক্‌সর্বস্বতা আর অকর্মণ্যতার জন্য মানিক মিয়া কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। **দরবার-ই জহুর** গ্রন্থে জহুর হোসেন চৌধুরীও কিছু-কিছু তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, অনেকে মনে করেন আয়ুবের প্রতি ভাসানীর 'দুর্বলতা' ছিল। জহুর লিখেছেন: "মওলানা সাহেব একবার এমনও ভাবছিলেন বলে অনেকে বলে যে, আয়ুবের মারফতেই হয়তো কৃষক-জনতার বেশি উপকার করা সম্ভব হবে।"

সমালোচকেরা বলতে পারেন, এসবই হল ১৯৪৭-উত্তর যুগে ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা বা চিন্তার দৈন্যের প্রকাশ এবং প্রমাণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উদ্ভবের পর এই ধরনের আরও প্রমাণ সমালোচকদের হাতে আসে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, রুশ-ভারত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বাস্তব, কাল্পনিক অভিযোগ তুলে ধরায় ভাসানী ছিলেন সদাই সোচ্চার। এর জন্য হক কথা পত্রিকায় নির্জলা মিথ্যা তথ্য পরিবেশনেও ভাসানীর বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। অথচ চীন, আমেরিকা আর পাকিস্তানের যেসব দোসরদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ সামরিক শাসন আর সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাসে নিপতিত হল, তাদের নিন্দায় ভাসানী ছিলেন বিমুখ। আবার, ভাসানীর দলে কট্টর বামপন্থী থেকে চরম দক্ষিণপন্থী, এমন-কি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিচিত্র সমাবেশ ঘটায় ভাস্কারদের পক্ষে ভাসানীকে প্রগতিশীল বামপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করাও মুশকিল হয়ে পড়ে।

ভাসানী সম্পর্কে এসব বিতর্ক মকস্থদ যেভাবে এড়িয়ে গেছেন, তাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, মকস্থদ কিছু-কিছু সত্যের সম্মুখীন হতে নারাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে মেজর জলিলের দেশপ্রেমের প্রশংসায় মকস্থদ মুখর, সেই জলিল আর তার সাঙ্গো-পাঙ্গরা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই লুঠতরাজ-হত্যা ইত্যাদি দ্বারা একটি জেলায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, এবং সেই জেলার প্রশাসক (যাঁর সততা, বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের কথা মকস্থদের অজানা থাকার কথা নয়) জলিলের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাসানীর মতো মকস্থদও ভারতের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার চালাতে অনিচ্ছুক নন। উদাহরণস্বরূপ, মকস্থদ লিখেছেন, বাংলাদেশের মানুষ সন্দেহ করে যে ভারতে ছাপা নোট মুজিব আমলে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ। কিন্তু মকস্থদ একথা বেমালুম চেপে গেলেন যে, যদিও রটনা অনুযায়ী ভারত নির্ধারিত সংখ্যার দ্বিগুণ নোট ছেপেছিল, বস্তুত নোট প্রত্যাহারের সময় দেখা গেল ভারতে মুদ্রিত ৩৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা কম জমা হয়েছে! অর্থাৎ ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, এটি ছিল একটি বিকট গুজব। আবার, চোরা চালানের ব্যাপারে ভাসানীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মকস্থদও আওয়ামী লীগ আর ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলেছেন। এ সম্পর্কে জহুর হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য মকস্থদের নজরে আনা উচিত: "বর্তমানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ভারতে সম্পদ পাচারের অভিযোগ যখন করা হচ্ছে তখন অতি সুবিধা-জনকভাবে ভুলে যাওয়া হয় পাকিস্তান আমলে সব সময়েই ভারতে চোরা-চালান অব্যাহত গতিতে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে পাট রফতানীর দ্বারা অর্জিত শ, শ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা শিল্পায়নে ব্যয় না করে বিভিন্ন বিলাস-দ্রব্য অবাধ আমদানী লাইসেন্সের দ্বারা আমদানী করে যে বাজার ভরিয়ে ফেলা হয়েছিল তার অধিকাংশ যে ভারতে চোরাচালান হয়েছিল তার প্রমাণ করাচীর পথে-ঘাটেই সে সময়ে দেখা গিয়েছে।"

আর উদাহরণ বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এক কথায়, ভাসানীর কর্মধারা সমর্থনের নিরন্তর প্রয়াসে পুস্তকটিকে আচ্ছন্ন না করে মকস্থদ যদি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দিকে নজর দিতেন, তাহলে তাঁর পরিশ্রম অনেক বেশি সার্থক হত। তা সত্ত্বেও বলা যায়, **ভাসানী** পড়ে পাঠকসমাজ সবিশেষ উপকৃত হবেন।

মৌলানা ভাসানী তাঁর একটি বিখ্যাত নিবন্ধে লেখেন যে, বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি 'ত্যাগী চিন্তাবিদ'। ১৯৪৭-এর পূর্বে উপমহাদেশে যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ত্যাগী চিন্তাবিদদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। ১৯৪৭-এর পরে নতুন কোনো ত্যাগী চিন্তাবিদকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি দুই-একজনও থাকেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বদরুদ্দীন উমর। অন্যান্য অনেক বাম-মধ্য-দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও বড়ো-বড়ো

বুলি আউড়ে সামরিক-বেসামরিক আমলে মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করতে পারতেন—নিদেনপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদ। কিন্তু তিনি যথার্থই ত্যাগী চিন্তাবিদের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-গবেষণার সহজ কাজ ছেড়ে শোষিতদের সংগঠিত করায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য অতীতে প্রকাশিত অন্যান্য সংকলনের মতো বর্তমান সংকলনেও পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। **বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক** প্রধানত এরশাদশাহির উপর ১৫১-পৃষ্ঠাব্যাপী ২৪টি প্রবন্ধের সংকলন।

বদরুদ্দীনের মতে, বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দলই —বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী—বুরজোয়া স্বার্থেই কাজ করে। তাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বুরজোয়া স্বার্থ-সিদ্ধিরই চেষ্টা। ফলে তাদের সঙ্গে সামরিক শাসকদের একাত্মতা অনস্বীকার্য। শ্রেণীগত অবস্থান বুরজোয়াদের সামরিক ও বেসামরিক অংশের মধ্যে, এবং রাজনৈতিক দলগুলির বাম আর দক্ষিণ পক্ষের মধ্যে ঐক্য রচনা করেছে। বেসামরিক বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সামরিক সরকারের যে দ্বন্দ্ব, তা কোনো মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়; এটি হল শাসন-পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ, যা থেকে সমাজের আমূল পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

বদরুদ্দীন একথাও জোর দিয়ে লিখেছেন যে, বাংলাদেশের বুরজোয়া-শ্রেণী স্বাধীন জাতীয় বুরজোয়া নয়। বুরজোয়া শোষকদের প্রায় সবাই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা—বিশেষত মার-কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা—নিয়ন্ত্রিত। বুরজোয়া দলগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় অক্ষম; ফলে যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের দুর্বলতা প্রকট।

বদরুদ্দীন আশাবাদী। ব্যবসায়ী মূলধনের দাপটে বাংলাদেশের অর্থ-নীতি আজ এমন গভীর সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অস্থিরতা, প্রত্যয় ও প্রতিরোধ দানা বাঁধছে, এবং এই প্রক্রিয়াই বিকশিত হবে বৈপ্লবিক সংগ্রামে। বলা বাহুল্য, যাঁরা বদরুদ্দীনের সঙ্গে সহ-মত নন, তাঁরাও বদরুদ্দীনের সংগ্রামী চেতনা আর বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা চমৎকৃত হবেন।

জয়ন্তকুমার রায়

বঙ্কিমবিচারের নিরর্থক প্রয়াস

বঙ্কিমবীক্ষা—জয়ন্তী সাহা। সংবাদ, ৫৭/২ডি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। চল্লিশ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের উৎসভূমি নন, সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনারও উৎসমুখ। তাঁর লেখার আলোচনায় গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ সমালোচনা-সাহিত্য। বঙ্কিম-সাহিত্যকে অবলম্বন করেই বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনায় কয়েকটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেও তা গড়ে উঠেছিল, একথাও স্বীকার্য।

বঙ্কিম-কৃত সাহিত্য-সমালোচনা এবং ধর্ম ও দর্শন আলোচনা পড়লে বোঝা যায়, তিনি অষ্টাদশ শতকের য়োরোপের জীবনবোধকে সাহিত্য আর জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়ে-ছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের সপ্তবিংশতি-তম অধ্যায় ও উত্তরচরিত সমালোচনা (চতুর্থ অধ্যায়) থেকে প্রমাণিত হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ-শতকীয় পাশ্চাত্য জীবননীতিতে বিশ্বাস করতেন। হারবার্ট স্পেনসার যাকে বলেছেন, ইনক্রুটেবল পাওয়ার ইন নেচার, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই বলেছেন বিশ্বব্যাপী চৈতন্যরূপিণী শক্তি, এবং জাগতিক শৃঙ্খলা এই-শক্তিজাত বলে মনে করে-ছেন। নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি, এই প্রত্যয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অবিচল থেকেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দের য়োরোপে জাগতিক শৃঙ্খলা, নীতি এবং প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞানকে বড়ো করে দেখা হয়েছিল। বঙ্কিম সেভাবেই সমাজ আর সাহিত্য, জগৎ আর জীবনকে দেখেছেন। তা ছাড়া কবিজীবনের আলোকে কাব্যবিচারের কথাটি তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কাব্যের সৌন্দর্য নীতিবর্জিত নয়, এই ধারণাটি শেষের দিকে বঙ্কিম-চিত্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। (বর্তমান আলোচকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা লভ্য)

আবার, বঙ্কিম-শিষ্যের বঙ্কিম-সাহিত্য-ব্যাখ্যায় অনেক দূর এগিয়ে-ছিলেন। বঙ্কিমের মতবাদকে যদি জীবনাহরণী মতবাদ বলা যায়, তাহলে বঙ্কিম-শিষ্যদের মতবাদকে বলা

যায় নীতিবাদ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাঙলা সাহিত্য সমালোচনাকে গড়ে তুলেছিলেন, আবার তাঁকে উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে স্থবিপুল সমালোচনা। বঙ্কিমের জীবিতকালেই এর সূত্রপাত। গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী ('বঙ্কিমচন্দ্র' ১৮৮৮), জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ('প্রবন্ধলহরী' ১৮৯৬), রজনীকান্ত গুপ্ত ('প্রতিভা' ১৮৯৬), হারাণচন্দ্র রক্ষিত ('বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' ১৮৯৯), পূর্ণচন্দ্র বসু ('কাব্যসুন্দরী' ১৮৯৮), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি ঘোষ, স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্কিম-সমালোচনার প্রথম যুগে দেখা দেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্কিম-সমালোচনা-প্রবাহ সমানে বয়ে চলেছে। স্বীকার্য, বঙ্কিম-সমালোচনা শতাব্দীকালব্যাপ্ত। প্রথম উল্লেখ্য সমালোচনা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মুন্ময়ী' (জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮১/১৮৭৪খ্রী)।

বঙ্কিম-সমালোচনা-ধারায় সাম্প্রতিক সংযোজন ড. ক্ষেত্র গুপ্তের বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনার প্রথম খণ্ড (যা ইতঃপূর্বে 'চতুরঙ্গে' সমালোচিত)। এবং শ্রীমতী জয়ন্তী সাহার 'বঙ্কিম-বীক্ষা' (প্রকাশ-তারিখ ২৪ সেপটেম্বর৭, ১৯৮৪)। এই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএচ. ডি-উপাধিপ্রাপ্ত; এর উপ-শিরোনাম 'বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ-ইতিহাস-নিসর্গ'। ভূমিকাকার ও গবেষণা-পরিচালক, বিশিষ্ট বঙ্কিম-সমালোচক, এযুগের অগ্রণী লেখক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন, তাঁরই পরামর্শে গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি সংশোধিত এবং পুনর্লিখিত হয়েছে। আরো জানিয়েছেন, এ বই সকলেরই উপকারে লাগবে। তবে, "বইখানি বঙ্কিমের জীবনী নয়, বঙ্কিমজীবনীর উপাদান। এখন পরবর্তী উৎসাহী লেখকগণ এই-সব উপাদানের সার্থক ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনা করতে পারবেন বলে, আমার বিশ্বাস।"

ভূমিকাকারের এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। এক, এটি বঙ্কিম-জীবনীর উপাদান, এবং পরবর্তীরা এইসব উপাদানের সার্থক ব্যবহার করতে পারবেন, সুতরাং তার ব্যবহার এখানে হয় নি। এখানে উপাদানসমূহ কেবল বিন্যস্ত। দুই, এটি সাহিত্য-সমালোচনা নয়। স্বীকার্য, এই বইয়ের সীমাবদ্ধতা এর চেয়ে ভালো করে দেখানো যেত না।

তথাপি বইয়ের মূল্য কমে না। যদি এইসব উপাদানের সার্থক ব্যবহার লেখিকা করতেন তাহলে আমরা বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে নতুন কিছু পেতাম। ভূমিকাকার জানিয়েছেন, লেখিকা উপাদান-বিন্যাসের সামান্য পরিচয়দানে আগ্রহী। যে পরিচয় ভূমিকাকার দিয়েছেন তা থেকে উৎসাহিত হওয়া যায় না।

অতএব ভূমিকা ছেড়ে মূল গ্রন্থে আসা যাক। লেখিকা তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন — "বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্যের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণের প্রয়াসই আমার লক্ষ্য।"

স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়, লেখিকার দাবি ভূমিকাকার নস্তাৎ করে দিয়েছেন।

লেখিকার মূল থিসিস পাই "বঙ্কিমের শিল্পিব্যক্তিত্ব" নিবন্ধে। যেখানে তাঁর দাবি—"তাঁর কথা-সাহিত্যে কী কী সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক উপাদান কী কী ভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন—বিশেষভাবে সেইগুলিই আমরা নির্ধারণ করব।" (পৃ ২৩)

পুনর্বার লিখি, ভূমিকাকার লেখিকার এই দাবি স্বীকার করেন নি। লেখিকা পরবর্তী বাক্যে জানিয়েছেন, "এই ধরনের আলোচনা নিঃসন্দেহে যান্ত্রিক, শিল্পবিচারের কোনো ভূমিকা নেই, রসব্যাখ্যারও অধিকার নেই, নিছক তথ্যপঞ্জী আহরণ ও সংকলনই আমাদের কর্তব্য।" (পৃ ২৩)

তা-ই বলুন। তবে তো ভূমিকাকার ঠিকই মন্তব্য করেছেন। তবে আর বইটি লিখলেন কেন?

পরবর্তী অনুচ্ছেদ ও বাক্যে লেখিকা জানিয়েছেন—"কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। শিল্পবস্তুর মুখ্য বা গৌণ উপকরণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লেখকের প্রবণতা পরিস্ফুট হয়, তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্ব আত্ম-প্রকাশ করে।" (পৃ ২৩)

খুব ভালো কথা। কিন্তু বড়োই আক্ষেপের কথা, পরবর্তী চারশ পৃষ্ঠায় তা আদৌ দেখানো হয় নি। অথচ লেখিকার হাতে উপাদান মজুদ ছিল। আক্ষেপ, পুনরপি আক্ষেপ। পাতার পর পাতা তালিকা, নানা সংবাদের ও তথ্যের সমাবেশ। কিন্তু আদৌ তার কোনো ব্যবহার হয় নি। নায়িকার রূপবর্ণনায় বা নিসর্গের বর্ণনায় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের যে শিল্প-অভিলাষ রূপায়িত হয়, তা আদৌ আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয় নি। "বঙ্কিম-উপন্যাসে নায়ক ও নায়িকা" অধ্যায়টি বা "প্রকৃতি ও বঙ্কিমসাহিত্য" খণ্ড সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নৈরাশ্যকর। ছুটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে আমাদের আক্ষেপটা বোঝাই। লেখিকা রোহিণী-চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, (পৃ ৬৮-৬৯), সে কৃষ্ণকান্তের উইলের দ্বিতীয়া অথবা প্রধানা নারী। এই চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন হিন্দুসমাজের একটি চিরন্তন সমস্যা—বালাবিধবার রূপতৃষ্ণা ও জীবনভোগলিপ্সার প্রশ্ন। রোহিণীর আকাঙ্ক্ষায় মিশেছে ক্রূরতা। অসংযত বৈধব্য এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিবেগ বঙ্কিম দেখিয়েছেন, চিহ্নিত করেছেন তার দুরন্ত বাসনা-পীড়নকে। ব্যস। এখানেই বক্তব্য শেষ।

কেবল রোহিণীর রূপবর্ণনার বিশ্লেষণ করেই এক শিল্পরসে উপনীত হওয়া যায়, তা লেখিকার জানা নেই। রোহিণীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমের শিল্পজ্ঞান এবং চরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে তার বংসামান্য উদাহরণ দিই:

"রোহিণীর সৌন্দর্যও যেন তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবিরূপে পরিকল্পিত। কলসীতে জল আনার সময়ে তাহার যে মন্দাক্রান্তি অঙ্গভঙ্গী, পদক্ষেপের সঙ্গে সমতালে কলসীর যে ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা—এই সবই যেন তাহার অন্তরের রূপতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। রোহিণীর রূপের প্রধান কথা তাহার লীলাচঞ্চল, নৃত্যশীল গতিচ্ছন্দ; তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের তটদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে এই রূপ-নদীর প্রবাহধর্মী চলমানতা। আর বিধবরীর সঙ্গে সাদৃশ্য-বাঞ্জনার জন্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার 'কালভুজঙ্গিনীতুল্যা' কবরী। বঙ্কিমের ভাষা কিরূপ অভ্রান্ত শিল্প-জ্ঞানের সহিত সরল ও গুরুগম্ভীর শব্দাবলীর সমন্বয় সাধন করিতে পারে তাহা এই বর্ণনাতেই চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপাড়-ধুতিপরা, আর কাঁদের উপর'—লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমের অবদমিত কবি-প্রতিভা, তাঁহার ব্যঞ্জনার স্থৈচিত্য-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল, এবং তিনি বাক্যটিকে শেষ করিলেন অসাধারণ শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে—'চারুবিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলীকৃতা, লোলায়মানা, মনোমোহিনী কবরী" [১৯৪৯, অজয়চন্দ্র সরকার-সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা' গ্রন্থের ভূমিকা।]

এই আশ্চর্য নিপুণ বিশ্লেষণের পাশে লেখিকার বিবরণটি আরেকবার দেখি—"বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে আশ্রয় করে অসংযত বৈধব্য ('বুঝি পানও খাইত।') এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিবেগেরই পরিণাম নির্ধারণ করেছেন" (পৃ ৬৮)।

এর পর করজোড়ে লেখিকার কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছে করে—"তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।" এই কি সমালোচনা!

দ্বিতীয় উদাহরণ—চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দুর্যোগময়ী রজনীর বর্ণনা। বঙ্কিমবর্ণিত আলেখ্য (চন্দ্রশেখর, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)—শৈবলিনীর মানস-প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত পটভূমি—গাঢ় অনন্ত সর্বাবরণকারী অন্ধকারের পটভূমি—লেখিকা উদ্ধার করেছেন।

কেবল উদ্ধারই করেছেন। এ সম্পর্কে লেখিকার কোনো বক্তব্য নেই। তিনি তালিকা-রচয়িতা মাত্র। এই ভয়ংকরী নিসর্গ যে নিয়তির প্রতিমূর্তি, তার ইঙ্গিত লেখিকার ধারণায় আসে না। 'চন্দ্রশেখর'-এ তার বর্ণনা "তুমি ঐশী মায়া।"

অথচ এই শিল্পসত্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। তার উদাহরণ:

"বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনে দেখিয়াছেন দুইটি প্রধান শক্তির লীলা,—একটি প্রণয়, অপরটি নিয়তি।..... এই বিরাট শক্তিকে বলা যায় নিয়তি; সংসারের নিয়ম ও সনাতন ধর্মনীতি ইত্যাদি এই নিয়তিরই প্রকাশ। ইহার মধ্যে একটা ক্রূর পরিহাসপ্রিয়তা অনেক সময় দেখা যায়, যাহার ফলে আমরা জীবনে অনেক সময় 'শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি'। মানুষকে লইয়া নিয়তি খেলা করে, আমাদের বোড়ের মত সাজাইয়া দাবা খেলে, মানুষকে দিয়া আপন লীলা সম্পূর্ণ করে, কিন্তু চিরকাল ধরিয়া অনন্ত-কলরোল-মুখর এই যে লীলা চলিতেছে, তাহার তাৎপর্য কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।.....ইহারই নির্দেশে রাজা নগর জনপদের ধ্বংস ও সৃষ্টি চলিতেছে; বাদশাহের লাঞ্ছনা, শাহজাদীর গর্ব খর্ব হইতেছে, মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইংরাজ রাজ্য উঠিতেছে। কিন্তু অতি নিরীহ, এমন কি মহদাশয় মানব-মানবীও ইহার প্রকোপ হইতে বাদ যায় না। কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে, প্রতাপকে জীবন বিসর্জন করিতে হয়। কে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবে? 'তুমি ঐশী, মায়া, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম"। [অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা' ১৯৬১—'ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধ।]

আফশোস, বড়োই আফশোস! লেখিকা তালিকা প্রণয়ন করলেন, তা থেকে কোথাও পৌঁছলেন না।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভাবনা নিয়ে গল্প, গল্প নিয়ে ভাবনা

বনশি বাইগার অভিষেক—কানাই কুণ্ডু। নীলাঞ্জন, কলিকাতা ২৯। দশ টাকা।

বৃত্ত—বৈদ্যনাথ সাহা। পরিবেশক: দে বুক স্টোর, কলিকাতা ৭৩। দশ টাকা।

বেলা বয়ে যায়—রত্নেশ্বর বর্মন। নীলাঞ্জন, কলিকাতা ২৯। পনের টাকা।

প্রথম দুটি বইয়ের দুটি গল্প একটু আলাদা করে লক্ষ করবার মতো।

"বনশি বাইগার অভিষেক" বইয়ের গল্পটি এইরকম: বনের ধারে গ্রাম, সেখানে বাঘের উপদ্রব। শিকারিরা সরকারি লোক, আসলে তারাই নরখাদক। তাদের "খাদ্য" গ্রামের বউ রুমকি, গল্পের নাম "নরখাদক"।

আরেকটি গল্প "বৃত্ত" বইয়ের। বনের মধ্যে গ্রাম। সেখানে বাঘের উপদ্রব। শিকারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাণ্ডা, ছোটখাট জোতদার। আসলে সেই নরখাদক। তার খাদ্য গ্রামের বউ সুন্দরী। গল্পের নাম "নরখাদক"।

দুজনের লেখা, একই নামের; বলতে গেলে, একই গল্প। পাত্র-পাত্রীর নাম অবশ্য আলাদা, ভৌগোলিক পটভূমিকা আলাদা; কিন্তু তাতে বিশেষ, কিছু এসে যায় না, মামলাটা একই। দুজন লেখক একসঙ্গে গলা মিলিয়ে যে আসামিদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, বস্তুত তারা একই ব্যক্তি। তাতেও আপত্তির ততটা কারণ থাকত না, বৃহৎ কথাসরিৎসাগরে দুটি ক্ষুদ্র কাহিনীকে মিলিয়ে যেতে দিতে পারতাম, যদি না আর-একটা বড় ভাবনার কথা এর মধ্যে থাকত। এই গল্প দুটি পড়বার সময়ে—যে-কোনো পাঠকের মনে হতে বাধ্য, এই একই আসামিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একই মামলার শুনানি তো আমরা হাজার বার শুনেছি, অহরহ শুনছি, রায় যা দেবার আজ তা হাজার বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং সে রায়ের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চতর আদালতে আপীলও তো কেউ করে নি, তবে আর নতুন করে এত সাক্ষী-সাবুদ, এত জবানবন্দী, এত "আরগুমেন্ট" কীসের জন্যে? এখন অবস্থাটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রথম গল্পটি পড়তে আরম্ভ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না, কে নরখাদক, কে তার খাদ্য। তারপর দ্বিতীয় গল্পের লেখক মুখ হাঁ করবার আগেই তাঁর নরখাদকটি ধরা পড়ে যান। বাঘ-ভালুক কিছু নয়, আসলে মানুষই নরমাংসলোলুপ, এই তত্ত্বটা এবং সেই মানুষ কে; এবং কাদের সে ধরে ধরে খায়, এসব, সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, আজকাল ইস্কুলের ছেলেরাও জানে। সমাজে অবস্থাটা যে রকমই হোক, গল্পে-উপন্যাসে, সিনেমা-থিয়েটারে-যাত্রায়, "শ্রেণী-শত্রু"দের অবস্থা আজ বড়োই করুণ। লেখক-নাট্যকার-পালাকার যদি তাকে উপযুক্ত শাস্তি নাও দেন, পাঠক এবং দর্শককুল যে সমস্বরে তাকে ধিক্কার দেবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

সত্যি কথা বলতে কী, এই যে আমাদের এখনকার গল্প উপন্যাস যাত্রা-থিয়েটারের ভিলেন, এদের মত সুসম্পূর্ণ সুডৌল বদচরিত্রের মানুষ আমরা বইয়ের পাতায়, থিয়েটারের স্টেজের বাইরে কোনো দিন দেখেছি কিনা সন্দেহ। এরা একাধারে যেমন অর্থলোভী, তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। বিলিতি গল্প। যখন ঘোড়ায় টানা স্টেজ-কোচ চলত, সেই আমলে, কোচোয়ানের পাশে দুটি সীটে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আর বদখত চেহারার একটা লোককে অল্প একটু জায়গায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়েছে। মেয়েটির পরনের ফ্রকটি একটু খাটো, থেকে-থেকে হাঁটুর ওপরে উঠে যাচ্ছে, আর মেয়েটি আড়-চোখে পাশের লোকটার দিকে চাইছে আর ফ্রকটাকে টেনে-টেনে হাঁটুর নীচে নামাবার চেষ্টা করছে। লোকটা অনেকক্ষণ এই দৃশ্য দেখে শেষকালে বিরস গলায় বলল, "শুধু শুধু অত ব্যস্ত হয়ো না, বাছা। আমাকে খেয়েছে মদে।" কিন্তু আমরা এমন কোনোও মাতালের চরিত্র কল্পনা করতে পারি না যে মেয়েমানুষ দেখলে বেসামাল না হয়, আমাদের কল্পিত সুদ-খোর মহাজনের একটা চোখ যদি থাকে খাতকের যৎসামান্য জমিজমা এবং জরাজীর্ণ ভদ্রাসনটির ওপর, তার আরেকটি চোখ সে বেচারির যুবতী স্ত্রী অথবা ক্ষেত্রান্তরে তরুণী কন্যার ওপর অবশ্যই থাকবে।

এইটেই ভাবনার কথা। মানুষের চরিত্র এবং মানুষের জীবন, এবং এই যে বৃহৎ, জটিল জগৎ-সংসার, এত যার মধ্যে অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধিতা, ভালোয়-মন্দয় এত যেখানে গভীর আলিঙ্গন তাতে কি অরুচি জন্মে গেল আমাদের? নাকি, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে-সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌছবার একটা সিধে রাস্তা আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এবং সেই জন্যেই, পথে যাতে দেরি না হয়, মানব-চরিত্রের কোন জটিলতা, মানুষের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভাল-মন্দের কোন মিশ্রন, ইত্যাদি যা কিছু—পাঠককে এক মূহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে, তাকে বেমালুম অস্বীকার করে করে যাচ্ছি?

এই রকম একটা অনুমান কখনও কখনও এড়ান কঠিন হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হয়, লেখক তার লেখার যেটা প্রধান উপজীব্য, অর্থাৎ মানুষ এবং তার সমাজ, তার দিকে সরাসরি কখনও তাকাননি। যা সবাই বলে তিনিও তাই বলেন, যা সবাই বিশ্বাস করে তিনিও তাই বিশ্বাস করেন। মানুষ তাঁর গল্পে সত্যিকারের রক্ত-মাংসের জীব নয়, সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তাঁরই, কল্পনারও বলব না, পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার অনুকৃতি, এ সব কথা বিশেষ করে মনে হয় বৈদ্যনাথ সাহার "বৃত্ত" বইটি পড়বার সময়।

"বনাশি বাইগার অভিষেক"-এ কিন্তু এটুকু বোঝা যায়, কানাই কুণ্ডুর দেখবার চোখ আছে, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের গভীরতা বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পকে স্বতন্ত্র একটা মূল্য দিয়েছে, একটা বিশ্বাসযোগ্য ভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে যে গল্পে সেই আদিবাসী সমাজের বস্তুগত ও মানসিক পরিমণ্ডল নিজস্ব একটা সত্তা লাভ করেছে, সেখানে সেই অস্তিত্বই শক্তি সঞ্চয় করেছে গল্পের মধ্যে। প্রথম গল্প "চক্রব্যূহ", যেমন, অতিনাটকীয়তা এবং একটু চড়া রঙের কাজ সত্ত্বেও, আদিম, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক মানব-মানবীর জগতে পাঠককে নিয়ে যেতে পেরেছে শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিকের কঠিন বাস্তবতার জোরে। 'পিতৃঋণ' গল্পে বাস্তবতা আরো কঠিন, যদিও একটু অন্য অর্থে, কঠোর, কষ্টদায়ক অর্থে। এ গল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, সামাজিক পরিবেশ প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যেকার যে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা সেটা সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। বইয়ের সার্থকতর গল্পগুলির এটি একটি। বোঝা যায়, এর গহ্বরে রাগের একটা আগুন গনগন করছে, কিন্তু এ সেই আগুন যাতে কাঁচ আরো স্বচ্ছতা পায়। যা চোখের আলোকে আরও উজ্জ্বল করে।

কানাই কুণ্ডুর গল্পে রুক্ষ মাটি আর পাথর আর কাঁকর, আর অবাধ্য বন্য পরিবেশ, আর সেখানকার রুক্ষ পাথুরে বন্য জীবন, আর সেই পরিবেশ এবং জীবনের সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার সংসর্গ থেকে যেসব অবাঞ্ছিত উপসর্গের জন্ম হয়ে থাকে, এ-সব যেন একরকম নিজের জোরেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। যেখানে তাত্ত্বিক চিন্তা কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা লেখককে অমসৃণ জীবনের প্রত্যক্ষ-স্পর্শ থেকে আড়াল করতে পারে নি, সেখানেই তিনি সার্থক।

দুঃখের বিষয়, বৈদ্যনাথ সাহা, যিনি সুখপাঠ্য সক্ষম গদ্য লিখতে পারেন, যাঁর লেখাতে সুন্দরবন অঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়, তিনি বারে বারে অমূর্ত ধারণার জাল ফেলে বাস্তব জীবনটাকে ডাঙায় তুলতে চেয়েছেন, বারে বারে সত্যিকারের মাছ সেই অজাগতিক জালকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। সমাজে শোষণ-পীড়ন চলছে, অতএব তাঁর গল্পে মানুষের স্থান নিয়েছে, শোষক-পীড়কের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি; সমাজে অবক্ষয় অতি প্রবল, অতএব তাঁর গল্পে অবক্ষয় এত সহজ, এত নিরঙ্কুশ যে মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের, শিক্ষিত মেয়ে, উচ্চ সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন যুবকের বোন, মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। অথচ, এ সেই সমাজ—যেখানে পাড়ার দাদারা পাড়ার বোনেদের চাল-চলনের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে থাকেন। এ সেই সমাজ, যেখানে "অপসংস্কৃতি-"র চেয়ে নিন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না। এবং, এ সেই সমাজ যেখানে প্রশংসা এবং পুরস্কার পাবার সোজা রাস্তাটা নিয়েছে—"সমাজ-সচেতন" শিল্পের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক অবক্ষয় যে কী মারাত্মক, প্রধানতঃ সেই সত্য উদ্ঘাটনের পথে। অবক্ষয়-অবলোকন এখন, বলতে গেলে, আমাদের সর্বপ্রধান শিল্প-সাহিত্যগত নেশা। অবক্ষয় অনুধাবন যাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর পক্ষে এই ব্যাপারটাও লক্ষণীয়। বৈদ্যনাথ সাহা যদি সরাসরি মানুষের মুখের দিকে তাকাতেন, নিজের ত্বক দিয়ে ছুঁয়ে জগতের এবং জীবনের স্বরূপটা জানবার চেষ্টা করতেন, "বৃত্ত" গল্পটির মধ্যে যে সম্ভাবনাটুকু ছিল, একজন অতৃপ্ত, লেখকের আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে, যার একটা আভাসমাত্র দেখা দিয়েছিল, তা হয়তো গল্পটিকে সার্থকতার পথে খানিকদূর নিয়ে যেতে পারত। তেমনি "হাটগঞ্জের গল্প"-তে ইয়াকুবের মধ্যে

বাস্তবতার ধাতব আওয়াজ একটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটাও, যেন মনে হয়, প্রচলিত চরিত্র-কল্পনার তলায় প্রায় চাপা পড়ে গেছে। তবু, নিঃসন্দেহে এইটিই বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

রত্নেশ্বর বর্মনের গল্পেও সেই বঞ্চনা, শোষণ, অপরিসীম হতাশা, সমাজ-সংসারের ওপর ধিক্কারের বর্ষণ। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, কিন্তু তাঁর লেখায় কিছু শক্তির পরিচয় কোথাও-কোথাও পাওয়া যায়। সেই একই কথা, ইনিও নিজে যা দেখেছেন, বুঝেছেন, মনে মনে উপলব্ধি করেছেন, এঁর গল্পে তাই সত্য হয়ে উঠেছে, যা আগের থেকে ধরে নিয়েছেন, প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস থেকে গল্প ছেঁকে তুলবার চেষ্টা করেছেন, সেখানেই মানুষের অবয়ব, সমাজের বুনোট থেকে দূরে সরে এসেছেন, মনে হয়। "বীথি চলে গেছে"-তে ভেলিগুড়, কুমড়োর তরকারি এবং কলাই-করা গেলাসে চা সত্ত্বেও, সমস্ত ব্যাপারটাকেই যেন, বড়ো দূর থেকে দেখা, খানিকটা দেখার সঙ্গে অনেকটা ভেবে-নেওয়া বলে মনে হয়। "ভারতবর্ষ" গল্পে অবশ্য একটা ছায়া-নাটকের চরিত্র লেখকই আরোপ করেছেন, এবং সেটা তাঁর বৃহত্তর পটভূমিতে বেমানানও হয় নি, কিন্তু কোথাও-কোথাও, যেমন "বর্ণপরিচয়" গল্পে, কিংবা "বন্দিদশা"তে যেসব মানুষের রক্তমাংসের অবয়ব নিয়ে, মিশ্র জটিল সত্তা নিয়ে, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হওয়ার কথা ছিল, তারা সবাই কেমন যেন ঘনীভূত চিন্তার দ্বারাই গঠিত বলে মনে হয়। "বন্দিদশা"র অসীমকে লেখক একটা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তার সীমারেখার মধ্যে বাঁধতে পারেন নি, অথচ "বেলা বয়ে :যায়" গল্পের রাজকুমার রাজমিস্ত্রী তার তৈরি বাড়ির মতো অনস্বীকার্য বাস্তব,—তাই তার গল্পও সত্যের অবয়ব ও ভর-বিশিষ্ট একটা অনস্বীকার্য বস্তু। এরকম গল্প যিনি লিখতে পারেন তাঁর পক্ষে বায়বীয় ধারণার পশ্চাদ্ধাবন গভীর পরিতাপের বিষয়।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য

সম্ভব ছিল ? কাফকার অন্য রূপান্তর ?

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ফ্রান্‌ৎস কাফকার দিনপঞ্জির এক জায়গায় স্পষ্ট পড়তে পাই আমরা :

'পুঁজিবাদ আসলে পরনির্ভরতার সম্পর্কগুলোরই একটা ব্যবস্থা, বাইরে থেকে ভেতরে, ভেতর থেকে বাইরে, উঁচু থেকে নিচে, নিচু থেকে উঁচুতে পৌঁছে যায় সে। সবকিছুই গড়ে-তোলা ক্রমোচ্চ ভঙ্গিতে, ধাপে-ধাপে, সবকিছুই শেকলবাঁধা [অর্থাৎ একটা আরেকটার সঙ্গে নিবিড় জড়ানো]। পুঁজিবাদ জগতের একটা অবস্থা, আর আত্মারও।…আমরা যেন কোনো বস্তু হয়ে উঠছি, জীবন্ত অস্তিত্ব নয়, নিছক জড়বস্তুই যেন-বা।'

২

এ-কথা প'ড়ে খটকা লাগে আমাদের। এ-কোন্ কাফকার কথা শুনছি আমরা? যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অস্তিত্ববাদীদের প্রবক্তা, সেই কাফকার? এই কাফকা কি বলেন যে জন্মই আমার আজন্ম পাপ, জগৎটা অর্থ-হীনতায় আক্রান্ত, এই নিরর্থের হাত থেকে কোনো 'অমানুষিক' মৃত্যু ছাড়া আমাদের রেহাই নেই? অর্থাৎ তিনি কি অ্যাবসার্ড-এর শিল্পী, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রমরমা দিনগুলোয় যে-অ্যাবসার্ড-এর ধারণা হৈ-হৈ ক'রে 'সারা মুক্ত বিশ্বে' ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল? 'রূপান্তর' গল্পে গ্রেগর সামসা পোকা হয়ে গিয়ে মরে যায়, 'মামলা' বা 'বিচার' উপন্যাসে য়োসেফ কা. মরবার আগে অনুভব করে সে মরে যাচ্ছে কুকুরের মতো। মৃত্যুর এই 'অমানুষিক' চেহারা তো কাফকাই স্বয়ং দেখিয়েছেন। আর, তাহলে, কী মানে করব আমরা তাঁর দিনপঞ্জির এই টুকরোটার?

৩

কে ছিলেন এই ফ্রান্‌ৎস কাফকা, তবে? জন্মেছিলেন প্রাহায়, ১৮৮৩র জুলাই তিন তারিখে, মোটামুটি সচ্ছল এক য়িহুদি পরিবারে, তাঁর বাবা হেরমান নিজের পুরোপুরি চেষ্টাতেই একটা পাইকারি হোসিয়ারি ব্যাবসার মালিক হয়ে বসেছিলেন।

এই সরলসোজা তথ্যটার মধ্যে অনেক রকম গণ্ডগোল জড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই। নইলে আমাদের কেন সাত কাহন করে শোনানো হবে যে হেরমান কাফকা ছিলেন দশাসই ব্যক্তিত্বওলা লোক, তাঁর সামনে জুজুর ভয়ে ফ্রান্‌ৎস কুঁকড়ে থাকতেন, বারে বারে চেষ্টা করতেন বাবার তারিফ আর পিঠচাপড়ানি পাবার জন্যে।

হতেই পারে এ-কথা সত্যি; কেউ-কেউ হয়তো আস্তিন থেকে বার করে দেবেন সেই গল্প যেখানে ছেলে বাবার সঙ্গে মোলাকাত-এর পর ছুটে বেরিয়ে এসে সোজা ঝাঁপ খেয়ে পড়ে সাঁকো থেকে নদীর জলে, ভুউশ করে তলিয়ে যায়, আর বলা হবে, এ-গল্পই তো প্রমাণ যে বাবার সঙ্গে ফ্রান্‌ৎসের সম্পর্ক ভালো ছিল না, নিজের অপরিপূর্ণতার বোধ তাঁর এতই প্রখর ও তীব্র ছিল যে বাবার সামনে এলেই তাঁর বার-বার মরে যেতে ইচ্ছে করত।

তবে, একটু অন্যভাবেও খেয়াল করে দেখা যেতে পারে ব্যাপারটা।

ফ্রান্‌ৎস কাফকা যখন জন্মেছিলেন তখন চেকোস্লোভাকিয়া বলে কিছুই ছিল না। বোহিমিয়া আর স্লোভাকিয়া ছিল অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অধীন। য়িহুদিদেরও খুব-একটা পাত্তা পাবার জো ছিল না—যেমন ইওরোপের অনেক দেশেই সে-সুযোগ তাদের সামনে ছিল না। প্রাহায় জন্মেছেন, বড়ো হয়েছেন, সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন—কিন্তু ফ্রান্‌ৎস কাফকার আত্মপ্রকাশের ভাষা ছিল না চেখ, এমনকী য়িডিশও নয়, য়িহুদি হিশেবে যেটা নিশ্চয়ই পারিবারিক ও নিকট সামাজিক গণ্ডির মধ্যে চলত বরং তিনি বেছে নিয়েছিলেন আলেমান ভাষা—শাসক সম্প্রদায়ের ভাষা, পড়াশুনো করেছেন প্রাহার জারমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে লক্ষ করে দেখা যাক। একটা সাম্রাজ্য—আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ম-

কাঞ্চন সেনসরশিপের শেকলে বাঁধা, অথচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সবদিকে—অবক্ষয়, আর দারিদ্র্য, আর অপশাসন এমনই লাগামছেঁড়াভাবে জীবনের সবদিকে ছড়ানো যে একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন—কিন্তু সে-যুদ্ধ শেষ অব্দি এসে হাজির হয় ফ্রান্ৎসের বয়েস যখন ত্রিশ পেরিয়েছে। তাঁর কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ও প্রথম যৌবন কেটেছে এই আসন্ন যুদ্ধের অপচ্ছায়ায়। আর তিনি—চেখভাষীদের মধ্যে আলেমান-ভাষী, খ্রীস্টানদের মধ্যে য়িহুদি, রোগা, ছোটোখাটো, সংবেদনশীল, পড়তে চেয়েছিলেন সাহিত্য— কিছুকাল প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও ছিলেন, কিন্তু শেষ অব্দি ডিগ্রি করলেন আইনে, স্বাধীন ব্যাবসা না-করে ডক্টরেট করবার পর কাজ নিলেন সরকারি আপিশে, কারখানার মজুরদের দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের বিমা সংস্থায়, যক্ষ্মা হবার আগে পর্যন্ত এখানেই চাকরি করেছেন তিনি, আর পৃথিবীতে কোনো বিশুদ্ধ চাকরি না-থাকলেও মন দিয়ে কাজ করেছেন, শেষটায় তাঁর পদোন্নতিও হয়েছিল। কাজটাকে তিনি যে কতটা সিরিয়াসভাবে নিতেন তার ছোট্ট দুটি প্রমাণ—১৯০৮এ তিনি লিখেছেন 'রাজমিস্ত্রীদের কাজে বাধ্যতামূলক বিমা প্রসঙ্গে', ১৯১১-তে লিখেছেন 'কারখানায় ও খামারে দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়' এবং 'মজুরদের দুর্ঘটনা বিমা ও ম্যানেজমেন্ট'। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চাইতে এই লেখাগুলো কম জরুরি ছিল না। অথচ আপিশের একঘেয়ে কাজের সূচি আর নানারকম চাপ (বিশেষত দুর্ঘটনায় জখম মজুরদের ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্যে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অবিরাম বাদবিতণ্ডা) প্রচণ্ড ছাপ ফেলেছিল তাঁর অন্য লেখায়।

৪

কাকতালমাত্রেই অদ্ভুত আর তাকলাগানো, কেননা 'আপাত দৃষ্টিতে' দুই বা ততোধিক ভিন্ন ঘটনা বা সন্নিবেশের মধ্যে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার এ-রকম একটি কাকতালের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। ১৮৮৩তেই প্রাহায় জন্মেছিলেন আরেক চেক লেখক, তিরিশে এপ্রিল তারিখে, ইয়ারোস্লাভ হাশেক, যাঁর 'শাবাশ সেপাই শ্‌ভেইক' আজ প্রায় একটা কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে। ফ্রান্ৎস কাফকার মৃত্যু হয়েছিল যক্ষ্মায়, জুন তিন, ১৯২৪-এ। আর ইয়ারোস্লাভ হাশেকের, তিন জানুয়ারি ১৯২৩-এ।

প্রাহায় তাহলে একই সময়ে দিন কেটেছিল দুজনের। আর প্রাহা বড়ো শহরও নয়। পুরোনো এই শহরের মাঝখান দিয়ে গেছে নদী, শহরের একটা অংশ টিলার ওপর, রাস্তাঘাট এঁকেবেঁকে গেছে বিসর্পিল, গলিঘুঁজি, যেমন থাকে প্রায় সব পুরোনো শহরেই, আর এখানে আছে ইওরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা, কাফকা যেখানে বেশিদিন পড়েন নি, হাশেকও না।

দু-রকম স্বভাব এই দুই লেখকের, কিন্তু দুজনেই মধ্যবিত্ত সংস্কার ও নিয়মের নিগড় থেকে মুক্ত; হাশেক সত্যিকার বোহিমিয়ান, অথচ সাধারণ চেখদের মতো নন; গোড়ায় নৈরাজ্যবাদী, পরে রুশদেশ থেকে ফিরে হাশেক বিশ্বাস করেছিলেন মার্কসবাদে, ভয়ংকর-সব বিষয়কে অবলীলায় তিনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। হাসি তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল মলোটভ ককটেলের মতো বিস্ফোরক ও বিধ্বংসী। কাফকা—তাঁরও লেখায় শ্লেষ কৌতুক ব্যঙ্গ আছে, তবে তা সেইসঙ্গে বেশ চাপা, গম্ভীর এবং বিমর্ষও। তাঁকেও পৌঁছুতে হয়েছিল, কর্মসূত্রেই, পুঁজিবাদ সম্বন্ধে বিষম ঘৃণায়। হাশেক তাঁর 'শাবাশ সেপাই শ্‌ভেইক'-এ গুণগান করেছেন খুদে মানুষের; শ্‌ভেইক শেষ পর্যন্ত যে সত্যি কী—ধুরন্ধর চালাক, না হদ্দ আকাট—তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না—শুধু জানি সবরকম ফাঁদের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গলে বেরুবার একটা চমকপ্রদ ক্ষমতা তার আছে, আছে কোনোরকমে টিকে থাকবার ক্ষমতা, পরে বেরটোল্‌ট ব্রেখটের যা মনে হবে বীরত্বেরই এক নতুন সংজ্ঞার্থ। কাফকার লেখায় মানুষ মরে যায় কুকুরের মতো, পোকার মতো। হাশেকের লেখায় দেশপ্রেম, ভীরুতা, বীরত্ব, উদ্ভাবনীশক্তি—এ-সব কথারই প্রচল অর্থ প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে থুবড়ে পড়ে। 'ডিহিউম্যানেজাইশন'—দুজনেরই লেখার বিষয়। আমরা আরো আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করব, দুজনেরই মৃত্যু হবার আগে, ১৯২১ সালে, আরেকজন চেখ লেখক, কারেল চাপেক, 'রোবট' কথাটার প্রবর্তন করবেন চেখ সাহিত্যে, এবং বিশ্বসাহিত্যে যে শব্দটা এসেছে স্লাভ 'রোব' ধাতু থেকে, 'রোবোটা' থেকে, যার মানে কায়িক শ্রম, 'দাসশ্রম'। শস্তা শ্রমের জোগান দেবার জন্যে ব্যাবসাদার ও বিজ্ঞানী তরুণ রোসুম পালে-পালে রোবট তৈরি করেছিল, যাতে কারখানার উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমশ প্রতিবাদবিহীন সহজ, ছিমছাম ও নিপুণ হয়ে আসে। মানুষের বদলে, রোবট অর্থাৎ যন্ত্রমানবই পুঁজিবাদের বেশি পছন্দ—এই বোধ তাহলে প্রাহার হাওয়ায় তখন ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে কোনোকিছুই শূন্যের মধ্যে আচমকা গজায় না—তার জন্যে চাই উপযুক্ত পরিবেশ, আবহাওয়া, অভিজ্ঞতার একটা কাঠামো, কেমন করে ইতিহাস এমনকী মানবিক সম্পর্কগুলোকেও আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করে ফেলছে তার একটা স্পষ্ট বোধ। য়োসেফ কা. চাকরি করে ব্যাঙ্কে, গ্রেগর সামসা কাজ করে ফিরিওলার, ভ্রাম্যমাণ পণ্যবিক্রেতার। কেন তাদের মৃত্যু পুঁজিবাদী সমাজে অমানুষিক আয়তন পেয়ে যায়, তার একটা সূত্র, ধাঁধার জট খোলবার একটা চাবি হয়তো এর মধ্য থেকেই পাওয়া যাবে। 'সব শেকলে বাঁধা,' এমনকী এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সব সম্পর্কও—দিনপঞ্জির পাতায় লিখেছিলেন কাফকা। নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিয়েের্কেগাড়ের কথার প্রতিধ্বনি নেই।

৫

১৯০৭এ একটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন কাফকা, 'মফস্বলে বিয়ের প্রস্তুতি'। কয়েকটি বাক্য একটু লক্ষ করে দেখা যাক। গল্পের নায়ক রাবান তার বিয়ের আয়োজন করে বসেছিল অনায়াসে, আর তারপরে সে একটা আরশোলার শরীরের মধ্যে আবিষ্কার করে বসে তার অহংকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে :

'আমি এদিকে শুয়ে পড়েছিলুম আমার খাটে, হলদে-বাদামি শুজনি দিয়ে মসৃণভাবে ঢাকা বিছানায়, সে-ঘরে হাওয়া প্রায় ঢোকেই না, এখন অবশ্য ঘরটার মধ্যে হাওয়া খেলে যাচ্ছিল। চকচকে মাটিতে বাইরে গাড়িঘোড়া যাচ্ছে, লোকে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটু ইতস্তত করে, কারণ আমি এখনও স্বপ্নই দেখছিলুম। কোচোয়ান আর পদাতিকেরা একটু হয়তো-বা লাজুকই, এক পা বাড়াতে গিয়ে তারা যেন আমার কাছ থেকে বদান্যতাই আশা করছে, একবার করে তাকিয়ে দেখছে আমায়। আমি উৎসাহই দিচ্ছি তাদের, কোনো বাধারই সামনে পড়ছি না।

'খাটে শুয়ে থেকে-থেকে আমি একটা মস্ত আরশোলার রূপ নিয়ে নিই—আরশোলা কিংবা কোনো গুবরেপোকাই হবে, বোধহয় আমার।…

'হ্যাঁ, মস্ত একটা আরশোলারই রূপ। আমি তখন ভান করব যে এ হল আসলে খোলসবদলের আগে শুয়ে-থাকারই একটা ধরন, আর ফোলা পেটের ওপর আমার খুদে-খুদে পাগুলো চেপে ধরব আমি। আর ফিশফিশ করে বলব দু-একটি কথা, নির্দেশ পাঠাব আমার করুণ শরীরটাকে, আমার কাছেই সেটা বেঁকেমুচড়ে দাঁড়িয়ে আছে…'

স্বপ্নের মধ্যে যেমন হয়, পুরো ব্যাপারটাই তেমনি। এডুয়ার্ড রাবান আরশোলার মধ্যে প্রক্ষেপ করে দেখছে নিজের ব্যক্তিসত্তা—এখনও রাবান আর গুবরেপোকাটি আলাদা-আলাদা জীব—কিন্তু কতদিন আলাদা থাকবে দুজনে? পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে কতদিন লাগবে মানুষের? কাফকার 'রূপান্তর' গল্প প্রথম বেরিয়েছিল ১৯১৫-তে, 'মফস্বলে বিয়ের প্রস্তুতি'র আট বছর পর।

৬

'এই ফিরিওলাগুলো, এই ভ্রাম্যমাণ পণ্যবিক্রেতারা—সবাই একেকটা নাছোড় পোকার মতো।' তখন লোকে বলত প্রাহায়, বার্লিনে। ফ্রান্ৎস কাফকা শুধু সাদৃশ্যবাচক 'মতো' শব্দটিকে গল্প থেকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

৭

'অস্বস্তিকর স্বপ্নগুলো থেকে গ্রেগর সামসা যখন একদিন সকালে জেগে উঠল, **সে দেখতে পেলে** সে তার বিছানাতেই একটা অতিকায় পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সে শুয়ে আছে চিতপাত, পিঠটা যেন সাঁজোয়া বর্ম এত কঠিন, আর যখন মাথাটা একটু তুললে সে, **সে দেখতে পেলে** তার গম্বুজের মতো খয়েরি পেটটা বাঁকা শক্ত কতগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে যার ওপর শুজনিটা ঠিকভাবে রাখাই যাচ্ছে না, পুরোপুরি একপাশে গড়িয়ে পড়ে যাবে বুঝি। **তার চোখের সামনে** তার অগুনতি পা—তার গোটা শরীরের তুলনায় সেগুলো বেজায় করুণভাবে সরু—অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক দুলছে।'

আলেমান ভাষায় অতিকায় পোকা ছিল 'ungeheueres Ungeziefer' (ungeheuer শব্দটির মানে আভি-

ধানিকভাবে কী-কী দাঁড়ায় দেখা যাক : monster, ogre ; enormous, immense ; tremendous ; outrageous, dreadful ইত্যাদি। ungeziefer অর্থাৎ pests, vermin। 'These travelling salesmen are like pests'—এটা প্রায় আক্ষরিক তরজমা হয় ফিরিওলাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণার। ungeheur—অর্থাৎ এমন প্রাণী, পরিবারে যার কোনো স্থান নেই। Un—এ-কথার দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা, বিদেশীত্বও নিশ্চয়ই পর-পর দু-বার শোনা যাওয়ায় চাপা থাকে না।)

'মফস্বলে বিয়ের প্রস্তুতি'তে স্বপ্ন অস্বস্তিকর ছিল না। এ ক-বছরে কী তাহলে ঘটেছে, যাতে স্বপ্নগুলো এমন তীব্রভাবে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ?

৮

কাফকার গল্প অবলম্বনে স্টিভন বেরকোফ-এর নাট্যরূপের একটা টুকরো :

একটা জোরালো টিকটিক আওয়াজ শোনা যাবে এই দৃশ্যের আগাগোড়া—গ্রেগর তার বাড়ির লোকের পেছন-পেছন যান্ত্রিকভাবে কুচকাওয়াজ করে যাবে, আর ওই টিকটিক আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে অন্যরা বলে যাবে তাদের কাছে গ্রেগরের কী মানে।

গ্রেটা : গ্রেগর !
হের সামসা : টাকা !
গ্রেটা : গ্রেগর !
হের সামসা : জুতো !
গ্রেটা : গ্রেগর !
হের সামসা : চুরুট !
গ্রেটা : গ্রেগর !
ফ্রাউ সামসা : খাবার !
গ্রেটা : গ্রেগর !
হের সামসা : বিয়ার !
গ্রেটা : গ্রেগর !
ফ্রাউ সামসা : জামা !
গ্রেটা (গ্রেগর যেই গ্রেটার পেছনে এসে দাঁড়ায়—পারিবারিক জীবনের এই মূকাভিনয় টিকটিক শব্দের সঙ্গে হচ্ছে এটাই বোঝাতে যেন কলের পুতুলদের স্বয়ংচল ক্রিয়াকলাপ—তারা একই অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে, শুধু কথা বলার সময়েই তাদের অঙ্গভঙ্গি থেমে নিশ্চল হয়ে যায়) : গ্রেগর, দুধ ?

স্টিভন বেরকোফ স্পষ্টতই তাঁর নাট্যরূপান্তরে গ্রেগর সামসাকে এক উৎপাদনযন্ত্রে পরিণত করে দিয়েছেন। সে আর মানুষ নেই, উৎপাদনের হাতিয়ার, যন্ত্রমানব যেন-বা। কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, এটা তো ব্যাখ্যা, অন্তরাখ্যান, কাফকার গল্পে কি তা আছে ? বেরকোফের বক্তব্য : 'গ্রেগরের পোকায় রূপান্তর হওয়াটা যেহেতু একটা মনোভাব, ইচ্ছে করে ভেবেচিন্তে ঠিক করা, যাতে সুপ্রকাশ করা যায় তার অন্তর্জগৎ, তার নগ্ন অ-মানুষিক ব্যক্তিত্ব, একটি কষ্ট-পেতে-থাকা লড়াই-করতে-থাকা পোকা, অতএব আমি নাটকটিকে এমনভাবেই যতদূর সম্ভব রূপ দিতে চেয়েছি যাতে পরিবারের মনোভাব আনন্দ / বেদনা / শঙ্কাকে স্থিরচিত্রের মতোই দেখায়—তৈরি-করা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া, ভিক্টরীয় অঙ্গভঙ্গি, পুরোনো ছবির কথা মনে করানো স্থির জমাট ভঙ্গি। যাতে গ্রেগরের কঠিন, ঝকমকে, যান্ত্রিক চলাফেরার প্রতিতুলনা হ'য়ে ওঠে পরিবারের বাকিদের ভঙ্গি বা মনোভাব।'

পুরোটাই কি বানানো ব্যাখ্যা স্টিভন বেরকোফের ? কাফকার লেখায় কি কিছু আছে, যাতে বেরকোফের এই নাট্যরূপ / প্রযোজনা স্বীকৃতি পেতে পারে ? প্রযোজনায় বেরকোফ গ্রেগরকে দেখিয়েছিলেন একটা লোহার খাঁচায়, আড়াআড়ি কতগুলো ডাণ্ডা গেছে, যা বেয়ে-বেয়ে সে উঠবে, ঝুলবে, শিকের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখবে পরিবারকে—দূর থেকে, মুক্তিহীন বন্দীশালা থেকে।

৯

১৯১৫-তে 'রূপান্তর' প্রকাশ করেছিলেন কুর্ট হেবাল্ফ, লাইপ্‌ৎজিগে, আর প্রথম সংস্করণে ছিল অটোমার স্টার্কে অঙ্কিত একটি সচিত্র মুখপত্র। কাফকা অটোমার স্টার্ককে বারে-বারে পই-পই ক'রে বারণ করেছিলেন, যাতে কোনো গুবরেপোকা বা আরশোলা দেখানো না-হয় ছবিতে। ছবিটা সাদা-কালোয় আঁকা, সাদা জমির মধ্যে কালো দেয়াল, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে একজন, এক পুরুষমূর্তি আর্ত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত, কালো চুল উড়ছে হাওয়ায়, দরজা খোলা, কোনো ছায়া নেই।

১০

কী ভেবেছিল গ্রেগর সামসা, যখন সে দেখতে পেলে যে সে একটা রাক্ষুসে পোকা হয়ে গেছে ?

'কী হয়েছে আমার ? সে ভাবলে **এ তো স্বপ্ন নয়।** তার ঘর, এ তো কেতামাফিক মানুষেরই শোবার ঘর, তবে একটু ছোটো এই যা, সে তো তেমনি পড়ে আছে চেনা চারটে দেয়ালের মধ্যে। টেবিলের ওপর যেখানে পড়ে আছে কাপড়ের কতগুলো নমুনা, প্যাকেটখোলা, ছড়ানো—সামসা এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা—তার ওপরে ঝুলছে একটা ছবি, নিজেই সে সেদিন একটা ছবির কাগজ থেকে কেটে সুন্দর সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এক ভদ্রমহিলাকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, ফার-এর টুপি পরা, ফার-এর চাদর জড়ানো, বসে আছে খাড়া হয়ে, মস্ত এক ফার-এর মাফলার বাড়িয়ে ধরে আছে দর্শকের দিকে যার মধ্যে তার পুরো বাহুটাই ঢাকা পড়ে গেছে।

'গ্রেগরের নজর তারপর পড়ল জানলায়, মেঘেঢাকা আকাশে—শোনা যাচ্ছে জানালার ওপাশে নালায় বৃষ্টি পড়ছে টপটপ—আর সেটা তার মন খারাপ করে দিলে। আরেকটু শুয়ে থাকলে কেমন হয়, এই বিশ্রী বাজে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাবে তাহলে, সে ভাবলে, কিন্তু তা তো করার জো নেই, কারণ ডান কাত হয়ে শোয়াই তার অভ্যেস, অথচ এখন তার এ-অবস্থায় সে পাশ ফিরতেই পারবে না। যতই জোরজার করে সে ডান কাত হতে চেষ্টা করুক না কেন, পরক্ষণেই সে ফেয় গড়িয়ে চিতপাত পড়ে থাকছে, অন্তত একশো বার সে চেষ্টা করে দেখলে, চোখ বুঁজে—যাতে তার অসহায় পাগুলোকে দেখতে না-হয়, আর শুধু তখনই চেষ্টাটা সে থামিয়ে দিলে যখন তার পাশে সে ক্ষীণ একটা ভোঁতা ব্যথা অনুভব করলে, আগে কখনও যেমন তার একবারও হয় নি।

'হা ভগবান, সে ভাবলে, কী একটা হয়রানির কাজ জুটিয়েছি আমি ! রোজ দিন ঘুরে বেড়াও। গুদোমে গিয়ে সত্যিকার ব্যাবসা করার চাইতেও বিরক্তিকর, তার ওপর রাতদিন ঘুরে বেড়াও, কখন কোন্ ট্রেন ধরতে হবে সে-কথা ভাব, কোথায় শোবে, কখন খাবে কিছু ঠিক নেই, কাজের সূত্রে কত লোকের সঙ্গে চেনা হয়, কিন্তু সব সময়েই নতুন-নতুন লোক, ককখনো কেউ আর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয় না। গোল্লায় যাক সব ! পেটে কেমন একটু চুলকুনি লাগছিল তার ; আস্তে-আস্তে সে পিঠ ঘষটে নিজেকে শিয়রের দিকে নিয়ে এল, যাতে আরো সহজে সে মাথা তুলতে পারে ; কোথায় চুলকোচ্ছে জায়গাটা শনাক্ত করলে সে, ছোটো-ছোটো শাদা-শাদা দাগে ছেয়ে গেছে জায়গাটা, সে আন্দাজই করতে পারলে না এগুলো আসলে কী, চেষ্টা করলে পা দিয়ে জায়গাটা ছুঁতে, কিন্তু তক্ষুনি সে পা সরিয়ে নিলে, কারণ ছোঁবামাত্র একটা ঠাণ্ডা হিম শিহর খেলে গেল তার মধ্যে।

'আবার সে ঘষটে-ঘষটে তার আগের অবস্থায় ফিরে এল। এই-যে ভোর রাতে উঠে-পড়া—সে ভাবলে—এতে যে-কেউই কেমন যেন হাঁদা হয়ে যায়। মানুষের তো ঘুম চাই। অন্য-সব ব্যাবসাদারেরা হারেমের হুরীদের মতো থাকে। যেমন আমি যখন সকালবেলা হোটেলে ফিরে আসি কী অর্ডার পেয়েছি লিখতে, এ লোকগুলো তখন সবে ছোটোহাজরিতে বসছে। আর আমি যদি একবার এ-চেষ্টা করি আমার কর্তার কাছে—অমনি আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে, ওখানেই। তা হোক গে, সে হয়তো আমার পক্ষে ভালোই, কে বলতে পারে ? আমার মা-বাবার জন্যে আমায় যদি অমন হাত কচলাতে না-হত তবে কবেই আমি ইস্তফা দেবার নোটিশ দাখিল করতুম ; আমি সোজা বড়োকর্তার কাছে গিয়ে বলে দিতুম তাঁর সম্বন্ধে আমি সত্যি-সত্যি কী ভাবি। সেটা তাহলে তাকে একেবারে কুপোকাত করে ফেলত তার টেবিলে ! ভারি তাজ্জব এই ব্যাপারটা, এই-যে টেবিলে বসে থাকা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে আর কর্মচারীদের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাবে কথা বলা, বিশেষ যখন তাদের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়, কেননা বড়োকর্তা আবার ভালো করে কানেও শোনেন না। তা, এখনও আশা আছে ; একবার টাকাটা ঠিকমতো জমাই, মা-বাবার দেনাটা শোধ করে দিই,—আরো পাঁচ-ছ বছর লেগে যাবে তাতে—তারপর একেবারে অব্যর্থভাবে কাজটা আমি করব। তখন মুখ খুলব পুরোপুরি, সব শুনিয়ে দেব। তবে, আপাতত, এই মুহূর্তে আমার উঠেপড়া উচিত, কারণ আমার ট্রেন ছাড়বে ভোর পাঁচটায়।'

১১

এইভাবে ভাবছিল গ্রেগর সামসা, সাত-পাঁচ কত-কী,

নিজেকে পোকা হিসেবে আবিষ্কার করার পর। 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি'—একজন কবি বলেছিলেন। গ্রেগরেরও তার নিজের চাকরি ভালো লাগে না। কিন্তু গ্রেগর অন্যদের—তারই মতো অন্য লোকদের—ঈর্ষা করে। আর এই ঈর্ষার মধ্যে থাকে এক নির্গলবিহীন আগ্রাসতাড়না। সে এটা ককখনো ভাবে না যে চাকরিদেনেওলারা অন্যদেরও তারই মতো নিংড়ে নিচ্ছে সবসময় অথচ পোকার ভেতরে মানুষের মন শশব্যস্তভাবে কত-কী ভেবে যাচ্ছে, কত-কী মিশ্র অনুভূতি: কিন্তু মূল ব্যাপারটা কারুই চোখ এড়ায় না নিশ্চয়ই। সে-কোন্ সমাজের মানুষ এই গ্রেগর? যে-সমাজে অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, কিন্তু অনেক চেনা লোক আছে, অর্থাৎ আছে ভিড়। যে-সমাজে সহকর্মীদের জন্যে সহানুভূতি নেই, আছে ঈর্ষা, আর এই বোধ—সব্বাই কত ভালো আছে, কেবল আমি নিজেই পরিবেশের একটা মস্ত থাপ্পড় খেয়েছি। সবাই যে সমান ভুগছি, সে-বোধটাই নেই, আছে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাগ। রাগটা আরো-বেশি বড়োকর্তার ওপর, বিষেভরা রাগ, চেপে-রাখা, ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছে, একদিন বড়োকর্তাকে সোজা মুখের ওপর সব শুনিয়ে দিতে হবে। সব শোধ করতে হবে—দেনা, আর রাগের জ্বালা। তবে আরো পাঁচ-ছ বছর লাগবে সব টাকা জমাতে, ততদিন শুধু এই রাগ, এই জ্বালা, এই ঈর্ষা সব টেনে-হিঁচড়ে ছিঁড়বে। রোজ, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ততদিন এ-চাকরি ছাড়া চলবে না, কেননা তাহলে আস্ত পরিবারের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে।

অসহায়, আর্ত, শহরের অজস্র লোকের মধ্যে একজন। তাই বলে তারই মতো অন্য লোকদের জন্যে গ্রেগরের কিন্তু কোনো সহানুভূতি নেই, নেই কোনো সহমর্মিতা। আর একা একজন খুদে মানুষ, এই অবস্থায়, সে তো একটি কীটানুকীট। পোকা একটা বিস্ফোরক উৎপ্রেক্ষা হয়ে ওঠে এইজন্যেই যে তার ভেতর কাজ করে যাচ্ছে একটি মানুষের মন—যত নগণ্যই হোক, যত তুচ্ছই হোক, মানুষ তো বটে।

১২

তাহলে সে কোন্ পটভূমি থেকে উঠে এসেছে গ্রেগর?

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগেকার অর্থনৈতিক সংকটের দিকে তাকানো যাক। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, দারিদ্র্য, সমাজবিমার অভাব, পরস্পরের মধ্যে হানাহানির বোধ, চেখ-জারমান-হাঙ্গেরীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অসহায়তা ও অনিরাপত্তার বোধ কতটা প্রবল আকার ধারণ করেছিল সেটা বোঝবার জন্যে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হতে হয় না। এই অবস্থা হিংসা, হিংস্রতার অনুকূল, যুদ্ধ যে অনিবার্য, আর যুদ্ধের মধ্যেই কাফকা যদি এই নগণ্য মানুষটিকে প্রধান চরিত্র হিশেবে বেছে নিয়ে গল্প লেখেন, তাহলে গল্পের চেহারা আর বক্তব্য যে কী হবে, তাও নিশ্চয়ই সহজেই বোঝা যায়। কাফকা কাজ করেন এমন এক সংস্থায় যেখানে খামারে-কারখানায় দুর্ঘটনায় পড়লে কতটা ক্ষতিপূরণ, কতটা বিমার টাকা একজনের প্রাপ্য হয়, সেটা বিবেচনা করে দেখা হয়। কিন্তু যার মাথা খারাপ হয়ে যায়, যার মনের অসুখ করে, যে স্কিৎসোফ্রেনিয়ার শিকার হয়, তার বেলা? তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, সে ক্ষতিপূরণ পাবে? মানুষটা মরে গেলে কেউ তাকে যদি বিনি দামে ওষুধের শিশি দেয়, তা নিয়ে বিষম সালিসী করা যেতে পারে বটেই, সেটা করতে পারে ভিখিরিরা, যাদের কোনো দাম দেবারই সংগতি নেই। কিন্তু গ্রেগর সামসার যদি মনের রোগ হয়, তবে তাকে সারিয়ে তোলবার দায়িত্ব কে নেবে?

কে, তাহলে, এই গ্রেগর সামসা?

তার বাবা ছিলেন কোনো সদাগরি প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান; সে নিজে পড়েছিল শস্তা গ্রামার স্কুলে, পরে যখন তার বাবা ছাঁটাই হয়ে যান চাকরি থেকে সে আর পড়াশুনো করবারও সুযোগ পায় নি, তাকে পড়া ছেড়ে দিয়ে তক্ষুনি সরাসরি চাকরি নিতে হয়; কোনোরকমভাবে মানসিক উন্নতি বা বিকাশের সে সুযোগ পায় নি; সে বোঝে না শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতি; সে ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা কেটে ফার-এ জড়ানো এক ঝকঝকে মহিলার ছবি গিলটিকরা ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়েছে নিজের শোবার ঘরে যে মহিলা চিরকালই তার অনায়ত্ত বা অনধিগম্য থেকে যাবে, কেননা তার শ্রেণীচরিত্র আর মহিলার শ্রেণীচরিত্র আলাদা; সে বোঝে না গান, তার বোন গ্রেটা যখন ঝমঝম করে বেহালায় সুর তোলবার চেষ্টা করে, ব্যর্থ চেষ্টা, সে তাকেই গান বলে ভাবে (আর এক চমকপ্রদ মুহূর্তে

সে নিজেকে জিগেস করে: 'সে কি তবে সত্যি জানোয়ার, যদি সংগীত তাকে এমনভাবে আলোড়িত করে? সেই অজ্ঞাত পুষ্টি যার জন্যে সে এতকাল বাসনাব্যাকুল হয়ে ছিল যেন তার পথ এখন তার সামনে খুলে গেল।'); তার মনে সব সময় হানা দেয় বড়োকর্তা আর হেডকেরানি, অন্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা আর তাদের শিক্ষানবীশরা, সেই কুলি যার মাথায় কিছুই ঢোকে না, অন্য-সব সদাগরি আপিশের দু-তিন জন ইয়ার, মফস্বলের এক হোটেলের এক দাসী (মধুর এক পলাতক স্মৃতি সেটা তার কাছে), এক দোকানের ক্যাশে বসত এক মেয়ে—তাকে সে প্রাণেমনে ভালোবেসেছিল, সহজে তবে মুখ ফুটে তা জানতে বড্ড সময় নিয়েছিল মনের কথা খুলে বলতে…

এইই তার জগৎ, এরাই তার স্মৃতির সম্পত্তি, এরাই তার মনের মধ্যে ভিড় করে থাকে। আর ভিড় করে থাকে, হয়তো যেমন দেখিয়েছেন স্টিভন বেরকোফ, এই কথাগুলো:

গ্রেটা: গ্রেগর!
হের সামসা: টাকা!
গ্রেটা: গ্রেগর!
হের সামসা: জুতো!
গ্রেটা: গ্রেগর!
হের সামসা: চুরুট!
গ্রেটা: গ্রেগর!
ফ্রাউ সামসা: খাবার!
গ্রেটা: গ্রেগর!
হের সামসা: বিয়ার!
গ্রেটা: গ্রেগর!
ফ্রাউ সামসা: জামাকাপড়!
কতটা টান লাগে মানসিক ভারসাম্য ছিঁড়ে ফেলতে?
কতটা চাপ লাগে মানসিক ভারসাম্য ধসিয়ে ফেলতে?

১৩

গ্রেগর সামসা যে পোকা হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু গল্পে আর কেউ ভাবে নি! তারা দেখেছে স্কিৎসোফ্রেনিয়ার রোগী, বদ্ধ এক উন্মাদ, যে নিজেকে পোকা বলে ভাবছে। অন্যরা তার সম্বন্ধে বলে 'প্রাণী', creature, অচেনা জীব—কেননা সে আর কর্মক্ষম উৎপাদনযন্ত্র নয় শুধু যেভাবে এতদিন সে তাদের সামনে দেখা দিত। তার বাবা তাকে কখনো বলেন নি দুর্দিনের কথা ভেবে তিনি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন; সে কখনও বলে নি তার বোনকে বড়োদিনের উপহার হিশেবে তাকে সে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবে; মায়ের সঙ্গে তার কতদিন কোনো কথা হয় না; বাজে হোটেলে রাত কাটানোর জের হিসেবে সে এমনকী বাড়িতেও নিজের ঘরে কুলুপ এঁটে রাখে। এমনকী বাড়ির লোকদের সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ নেই। মানুষ থেকে নিচে নামতে থাকে সে, প্রথমে পোকা, তারপর তার বোন তাকে বর্ণনা করে 'it' ব'লে: পেঙ্গুয়িন তরজমায় বেহালার তামাশার পর এইভাবে আছে ব্যাপারটা:

'My dear parents,' said his sister, slapping her hand on the table by way of introduction, 'things can't go on like this. Perhaps you don't realize that, but I do. I won't utter my brother's name *in the presence of this creature*, and so all I say is: We must try to get rid of *it*. We've tried to look after *it* and to put up with *it* as far as *humanly possible* and I don't think anyone could reproach us in the slightest.'

১৪

অতএব যে-'আপাত-বাস্তবতা'র সঙ্গে কাফকা এই পোকার মরজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেন, তা থেকে বিশেষ কোনো পোকার ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে না। অর্থাৎ তাকে শুধু এইভাবেই আমাদের বুঝে নিতে হবে যেমনভাবে তাকে সম্বোধন করে বাড়ির নতুন ঝি: 'ওরে বুড়ো গুবরেপোকা!' কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, কাফকা তার পরেই স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এমনতর সম্বোধনের কোনো জবাবই দেয় না গ্রেগর!' তার স্বরূপ কী, সেটা স্পষ্ট-কোনো চিত্রমূর্তি হিশেবে ফুটে ওঠে না—এইসব উল্লেখে। এমন-এক প্রাণী, বিছানা থেকে যাকে নামাতে দুজন দশাসই লোকের সাহায্য লাগে, (তার বাবার আর ঝির), সে নিশ্চয়ই কড়িকাঠ থেকে ঝুলে থাকতে পারে না, যতই না কড়া আঠালো হোক তার দেহের ক্ষরণ। সে কী-রকম

পোকা, যে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় কারু পেছন থেকে? সত্যি-যে, গ্রেগর মাঝে-মাঝে কোনো গুবরেপোকার মতো আচরণ করে, কিন্তু যখন বোনের বেহালা বাজানো শুনে সে বৈঠকখানায় গিয়ে আবির্ভূত হয়, তখন বিশুদ্ধ মানুষী সত্তা। কখনও সে এমন ভাবভঙ্গি করে যে মনে হয় সে কোনো নিচু শ্রেণীর মানুষ, 'পোকা কোথাকার', কিন্তু অন্য সময়—বিশেষ যখন সে পরিবারের আর্থিক বিপন্নতার কথা ভাবে—সে উদার, সহৃদয়, বদান্য। সে তাহলে এও নয়, ও-রকমও নয়, একই সঙ্গে দু-রকম, মস্ত এক হেঁয়ালি—যদি না সে হয়ে ওঠে হঠাৎ এক অসুস্থ মানুষ 'যে একদিন কল্পনা করে বসে যে সে এক রাক্ষুসে পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে,' যেমন বলেছেন ফ্রিডরিখ বাইস্‌নার। গ্রেগরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও তার অন্তর্জগৎ থেকে আমরা সরে আসি নি।

এই জন্যেই সম্ভবত হেলমুট রিখটার বলেছেন:

'**"রূপান্তর"** বর্ণনা করে এমন এক ব্যর্থতাকে যার অবসান হয় মৃত্যুতে।···গ্রেগরের মনে হয় তার চাকরি **মানুষ হিশেবে** তার বিকাশ রুদ্ধ করে আনছে, এভাবে আর চাকরি করা তার পোষাবে না আর এমন-এক স্বাভাবিক দুর্বলতার মুহূর্তে তার সর্বনাশ হয়ে গেল। আর তাই কাফকা সত্যি এমন কোনো ব্যর্থতাকে বর্ণনা করছেন না যেটা মানুষী অপূর্ণতা থেকে তৈরি হচ্ছে, বরং কর্মজীবনের চাপে পড়ে কারু ব্যক্তিগত জীবনটাও যে ধ্বসে গেল, এটাই তিনি দেখাতে চাচ্ছেন। গ্রেগর জিনিশ বেচে, সেজন্যে সারাক্ষণ চেষ্টা চালাতে হবে তাকে··· শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার জন্যে কেউ যদি পরিবারের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল চায়, যদি নিজের কাজে সে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দেয়, তাহলে এর জের এটাও হতে পারে পরিবারের জীবনটাই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। কারণ মানুষী উপাদান এর পরে সরে যেতে বাধ্য। উলটো দিকে, কেউ যদি পুরোপুরি নিজের জীবিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি না-হয়, তাহলে অন্তত এই ফল হয় যে নিজের পরিবারকে সে ভদ্রভাবে বাঁচতে সাহায্য করার দায়িত্ব অস্বীকার বা অবহেলা করছে।

'কাফকার নায়কের সমস্যা তাই মানবতার এই গভীর সংকটের মধ্যে প্রোথিত, যার জন্যে দায়ী বুরজোয়াদের অন্তহীন খাই-খাই দাবি, সাম্রাজ্যবাদের তলায় যেটা ক্রমে ক্রমে আরো তীব্র, আরো প্রখর হয়ে ওঠে, জীবনে এমন-সব স্ববিরোধের জন্ম দেয়, যা শুধু সমাজের নয় প্রতিটি ব্যক্তির আপন-আপন পরিবারের বিপদ ঘনিয়ে আনে।'

১৫

কাফকার গল্পে তাহলে, আসল রূপান্তর, গ্রেগরের ঘটে নি, ঘটেছিল তার পরিবারের।

লোকে কতটা সইতে পারে দুঃখ, আঘাত, আতঙ্ক? গ্রেগর সামসার যদি আচমকা (অন্তত বাড়ির লোকের কাছে সেটা আচমকা মনে হতেই পারে, কেননা তাদের কাছে তা ছিল অপ্রত্যাশিত—বিশেষত কারু সঙ্গেই যদি গ্রেগরের বনিবনা হওয়া দূরের কথা, কোনো যোগাযোগই না থাকে, কোনো মানসিক আদানপ্রদান যদি না থাকে, তবে কারু পক্ষে এটাও বোঝা সম্ভব নয় যে সে সারাক্ষণ একটা বিষম চাপের মধ্যে আছে।) পাগল-হয়ে-যাওয়াটা কোনো উদ্ধারবিহীন অবস্থা বলে মনে হয়ে থাকে, তবে গোড়ায় তাদের দশা যেন কেমন হতভম্ব, বিমূঢ় আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আগে থেকে তৈরি হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা ঠিক যে গত কয়েকদিন ধরে ঠাণ্ডা লেগে গ্রেগরের গলা কেমন ফ্যাশফেশে শোনাচ্ছিল। কিন্তু সে তো শরীর খারাপ বলে কোনো নালিশই করে নি। তাছাড়া তার আপিশের বিমার ডাক্তার কারু অসুখ করতে পারে বলেই বিশ্বাস করে না। গ্রেগর যে বাড়ি ছেড়ে বেরোয় নি, এটা বুঝতে পেরে কে যেন বলেছিল (গ্রেগর অবশ্য কোমল কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিল গলাটা তার মায়ের), 'গ্রেগর, পৌনে সাতটা বাজে। তোমায় না ট্রেন ধরতে হবে!' গ্রেগর ততক্ষণে মানুষের গলা হারিয়ে ফেলেছে, অন্তত তা-ই তার ধারণা। নিজের গলা শুনে নিজেই সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, কেমন একটা যেন অদ্ভুত কিচমিচ আওয়াজ হচ্ছে তার গলায়; তবু গ্রেগর চাচ্ছিল সব বিশদ করে বুঝিয়ে বলে, কিন্তু নিজের গলার আওয়াজ শুনে শেষটায় শুধু বলেছিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ, মা, আমি এক্ষুনি উঠছি।' তার গলার স্বর যে বদলে গিয়েছে সেটা—গ্রেগরের মনে হয়েছিল—দরজার ওপাশে বোঝা যায় নি, কেননা মা বোঝাই গেল তার জবাব শুনে তুষ্ট হয়ে দরজার কাছ থেকে চলে গেছেন (এটাও আরেকটা প্রমাণ হয়তো যে এই 'মানুষ-কীটের' মুখ থেকে গ্রেগরের গলার স্বর বেরুচ্ছিল—কোনো মনুষ্যেতর প্রাণীর নয়)। এবার বাবা দরজায় ঘা দিলেন, আস্তে, তবে ঘুষি মেরে, 'গ্রেগর, কী হয়েছে তোমার? পরে আরো ভারিক্কি রাশভারি চালে: গ্রেগর! গ্রেগর!' পরক্ষণেই অন্য পাশ থেকে বোন বললে, 'গ্রেগর? তোমার কি শরীর ভালো নেই? কিছু চাই তোমার?' দুজনকেই গ্রেগর বলেছিল, 'এই যে, তৈরি হয়ে গেছি,' যে-কথা শুনে তার বাবা ফের ছোটোহাজরির টেবিলে চলে গিয়েছিলেন (স্পষ্টই মানুষের গলাই তিনি শুনেছিলেন, তাই নাকি?)

কিন্তু হেডকেরানি যখন আপিশ থেকে তার খোঁজ নিতে এল তখন হুড়মুড় করে বিছানা ছাড়তে গিয়ে গ্রেগর ধপ করে মেঝেয় পড়ে গেল—একটা জোর আওয়াজ হল, তবে সত্যি কিছু ভেঙে যাবার আওয়াজ নয়। সেটা শুনে হেডকেরানি বললে, 'কী যেন পড়ল ওখানে!' (গ্রেগর তখন ভাবছিল—কাফকার যেটা চমকপ্রদ পরিহাস—আজ তার যা ঘটেছে, তা একদিন এই হেডকেরানিরও হতে পারে; এ যে সম্ভব সে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।) এবার গ্রেগরের বাবা বললেন, 'গ্রেগর, হেডকেরানি এসেছেন, তিনি জানতে চাচ্ছেন তুমি সকালের গাড়ি ধর নি কেন। ওঁকে যে কী বলব, আমরা তা ভেবে পাচ্ছি না। তাছাড়া উনি তোমার সঙ্গে নিজে কথা বলতে চান। কাজেই দরজা খোলো। তোমার ঘর আগোছালো দেখে উনি কিছু মনে করবেন না।'

হেডকেরানি বললে, 'সুপ্রভাত, হের সামসা।' মা বললেন, 'ওর শরীর ভালো নেই।' বাবা বললেন, কৈফিয়তের সুরে, 'বিশ্বাস করুন, ওর শরীর ভালো নেই। না-হলে ও খামকা গাড়ি ধরবে না কেন? ছেলেটা কাজ ছাড়া কিছুই জানে না! আমার বেশ রাগই হয় ওর ধরন দেখে, সন্ধেবেলা ককখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না, গত আট দিন ধরে ও এখানে আছে, অথচ একদিনও সন্ধেবেলা বেরোয় নি—রোজ বাড়ি বসে থেকেছে। চুপচাপ টেবিলে বসে হয় খবরকাগজ পড়েছে, নয়তো রেলের টাইমটেবিলের পাতা উলটেছে ··' ইত্যাদি।

তারা ডাক্তার ডাকার কথা ভাবছে, কিছুই কেউ বুঝতে পারছে না, হেডকেরানি গ্রেগরকে এ-ঘর থেকে ধমকাচ্ছে, বাবা রেগে যাচ্ছেন, মায়ের চোখে জল, বোন শশব্যস্ত। কিন্তু গ্রেগর এখনও বসবার ঘরে ঢোকে নি, শুধু দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীরের অদ্ধেকটা শুধু দেখা যাচ্ছে, জানলার ওপাশে ধূসর আলোয় দেখা যাচ্ছে হাসপাতালের দীর্ঘ, ঝাপশা ধূসর বাড়ি, বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ছে টপটপ, আর গ্রেগর যখন প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে কিছু ভাববার নেই, সে এক্ষুনি তৈরি হয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বে, তখন—

—তখন গ্রেগরের প্রথম দু-চারটি কথা শুনেই হেডকেরানি পেছিয়ে এসেছে, তার কাঁধ কাঁপছে, ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখছে তাকে হা করে। কী দেখেছিল সে তার চর্মচক্ষুতে? আমরা জানি না। শুধু এ তথ্যটা জানি যে গ্রেগর যখন কথা বলছে, বিশ্বাসযোগ্য একটা কৈফিয়ত খাড়া করতে চাচ্ছে, তখন হেডকেরানি একমুহূর্তও স্থির না দাঁড়িয়ে, গ্রেগরের ওপর থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে, পায়ে-পায়ে পেছিয়ে যাচ্ছে হল পেরিয়ে বাইরের দরজার দিকে। গ্রেগর জানে যে হেডকেরানিকে আটকাতেই হবে, তাকে বোঝাতে হবে ভালো করে, খুব তোয়াজ করতে হবে—কারণ পরিবারের আর্থিক সংগতি অথবা দুর্গতি এই চাকরির ওপরেই নির্ভর করে আছে। তার বাবা-মা হতভম্ব, কিছুই বুঝতে পারছে না; বোন গ্রেটা শুধু কাঁদছে; আর গ্রেগর তাড়াহুড়ো করে হেডকেরানির পেছন নিতে গিয়ে দেখতে পেলে হেডকেরানি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে, আর নিজে সে টাল শামলাতে না-পেরে আবার পড়েছে চিতপাত। মা ছোটোহাজরির চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলছেন, 'ছাখো-ছাখো, ভগবানের দোহাই, সাহায্য করো,' বলে গ্রেগরের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে তিনিও পেছিয়ে যাচ্ছেন, আর বসতে গিয়ে কফির কেটলি উলটে ফেলেছেন মাটিতে। আর গ্রেগরের বাবা হেডকেরানির ফেলে-যাওয়া ছড়িটা ঠুকে, টেবিল থেকে বড়ো খবরকাগজটা তুলে সেগুলো নাড়তে-নাড়তে গ্রেগরকে তার ঘরে তাড়া করে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।

একটা স্ল্যাপস্টিক কমেডির দৃশ্য—যেহেতু সবকিছুই স্বাভাবিকের চেয়েও দ্রুতবেগে একসঙ্গে ঘটছে—সবাই কমিক, কিম্ভূত, কিমাকার! কিন্তু কী তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন? কাকে? মানুষ, না গুবরেপোকা? গুবরেপোকা যদি হবে, তবে বুঝতে পারলেন কী করে যে এইই হল গ্রেগর—বা গ্রেগরের রূপান্তরিত রূপ?

কিন্তু হতভম্ব স্ল্যাপস্টিক কমেডির জগৎ থেকে আমরা আস্তে-আস্তে পৌঁছুব অন্য এক রূপান্তরিত জগতে। বাড়ির লোকে গোড়ায় অবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তারপর তার দেখাশোনার একটা চেষ্টা হবে, পরে রেগে উঠবে তার

ওপর, মনে হবে এঁদের ওপর এমন কুৎসিত দশা চাপিয়ে দেবার কোনো অধিকারই নেই গ্রেগরের, পরে ঘেন্না হবে তাদের, ঘেন্না আর ঔদাসীন্য—শেষে কিছুই এসে যাবে না, পাত্তাই দেবে না তারা সে বেঁচে আছে কি নেই তার ওপর। কোনোভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টাই তারা করবে না। তাদের এই ক্রমবিবর্তন অথবা ক্রমরূপান্তরই এই কমিক গল্পটাকে করে তুলবে দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ, দমবন্ধ-করা। সত্যি-বলতে, গ্রেগরের ওই ছোট্ট ঘরটা যখন আবর্জনার স্তূপে ভরে যাবে, অবহেলায় আর তাচ্ছিল্যে পরিণত হবে একটা junk room-এ, জঞ্জাল জমাবার ঘরে, আমরা কচিৎ বেরুবার সুযোগ পাব সে-ঘর থেকে। দয়া, করুণা, শুশ্রূষা নয়, গ্রেগর পাবে তাচ্ছিল্য, অবহেলা, ঘৃণা। শুধু তার মৃত্যুর পরই ঐ বাড়ি ছেড়ে বেরুব আমরা, দেখতে পাব বড়োদিনের হিম-কুয়াশা, বৃষ্টি, ধূসর আকাশের পর প্রকৃতি বদলে গিয়েছে আবার, আকাশে আলো, বাইরে সতেজ হাওয়া, নতুন বসন্তের খোলামেলা দিন, আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গ্রেটা আড়মোড়া ভাঙবে বাইরে।

'রূপবদল'—গল্পের এটা নাম। কার রূপবদল? অন্য কোনো নিয়তি কি ছিল গ্রেগরের, যখন তাকে পড়া ছেড়ে দিয়ে অমন একটা বাজে চাকরি নিতে হয়েছিল? রূপবদল—কিন্তু অন্য যারা, যারা পাগলও হয় নি, অথবা অসুখেও ভোগে নি, অথবা যারা নিজেদের পোকা বলেও ভাবে নি, তথাকথিত মানুষও থেকে গেছে শেষ অব্দি, তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো, সেগুলো কি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, মানুষের ছিল?

১৬

কাফকা শুধু প্রশ্ন তুলেই খালাশ, হেঁয়ালিটা তৈরি করেই ভাবেন তাঁর কাজ শেষ, উত্তর ভেবে নিতে হবে পাঠককেই। নিকোলাই গোগোলের পাগলের গল্পে যেমন, নাক হারানো ও ফিরে পাবার গল্পে যেমন, লেখকের দিক থেকে উত্তর হাতড়াবার যেন কোনো তাড়াই নেই, শুধু প্ররোচিত করা আছে পাঠকদের, যেন উশকে দিয়ে চেতিয়ে দিয়ে উত্তর খোঁজা হচ্ছে পাঠকদের কাছ থেকেই।

কাফকা নিজে খুব-একটা খুশি ছিলেন না গল্পের শেষ নিয়ে। দিনপঞ্জিতে এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'রূপান্তর'কে নিয়ে দারুণ বিচ্ছিরি লাগছে। অপাঠ্য সমাপ্তি। প্রায় যেন মজ্জায়-মজ্জায় খুঁতে ভর্তি।' গুস্তাফ ইয়ানৌখ বলতে চেয়েছিলেন যে সামসার নামটা কাফকার নামটারই ক্রিপ্টোগ্রামের মতো শোনাচ্ছে। শুনে কাফকা বলেছিলেন, বাধা দিয়ে, 'ক্রিপ্টোগ্রাম নয়। সামসা শুধু কাফকাই নয়, আবার তাছাড়া আর কিছুও নয়। "রূপান্তর" গল্প কোনো এজাহার বা স্বীকারোক্তি নয়, যদিও—এক অর্থে—একটা দোষস্বীকারই।' আলোচনার ছলে কাফকা যখন এ-কথা বলেন, সত্যি তখন তিনি কী ভাবছিলেন?

১৭

গ্রেগর সামসার কাহিনী বিচ্ছিন্নতার কাহিনী—অ্যালিয়েনেশনের রূপায়ন। পদে-পদে উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, উদ্বেগ সামসার, অথচ উদ্ভট, লাগামছেঁড়া, আঘাটে, কিন্তু সেইসঙ্গে বাস্তবও, কোনো গভীরতর অর্থে, আর অপরাধবোধ, নিঃসঙ্গতা, অক্ষমতার এক প্রচণ্ড মর্মপীড়াও তাতে মেশানো।

কিন্তু ব্যক্তি আর সমষ্টির সম্পর্কটাকে (নিঃসঙ্গতা মানে তো সমষ্টির অপসারণ, নিছকই কোনো ব্যক্তিমানুষের জ্বালা) যদি কোনো স্পষ্ট, মূর্ত, সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকায় না-ফেলা যায়, তবে মনে হবে নিঃসঙ্গতা ও অক্ষমতার এই বোধ বুঝি মনুষ্যজন্মেরই ভবিতব্য, একটা পরম ও চরম কিছু, নিত্য, পরিবর্তনহীন, শাশ্বত। কোন্ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মানুষ পরিণত হয় পণ্যে, দ্রব্যে, অমানুষে, (কাফকা দিনপঞ্জিতে বলেন: 'আমরা যেন কোনো জিনিশ হয়ে পড়েছি, যেন কোনো বস্তু, যেন জীবন্ত অস্তিত্ব নই') এটা না-বুঝলে, আমরা স্বয়ং কাফকাকে তো অসম্পূর্ণভাবে বুঝবই, তাঁর রচনাকেও বুঝতে পারব না। নিপীড়িত বা শোষিতদের জন্যে কাফকার সহানুভূতি কারুই অগোচর থাকে না যখন মনে পড়ে মজুরদের দুর্ঘটনাজনিত বিমাসংস্থার তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন, আর তাতে যে সামাজিক অন্যায় অবিচার বা বৈষম্য ভালো করে লক্ষ করার সুযোগ ছিল তাঁর, সেটাও আমাদের মনে প'ড়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতাকে কেমন ক'রে ছিঁড়ে খুঁড়ে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দেয় পুঁজিবাদের মধ্যে তাদের চাকরি বা জীবিকা, সেটা মোটেই কারু অন্তর্জগতের কাহিনী নয়। কিন্তু অ্যালিয়েনেশন এখন এতটাই যে নিজের মনে-মনে সেটা নিয়ে ভাবা যায়, কষ্ট পাওয়া যায়, অথচ কাউকে বলা যায় না, যেমন সে-কথা কাউকেই বলতে পারে নি গ্রেগর সামসা।

'ব্যবহারটা খুবই অদ্ভুত না কি,' আমরা পড়ি "রূপান্তর-"এ, 'ডেস্কে বসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলা, যাদের আবার একেবারে কাছে এগিয়ে আসতে হয়, কেননা বড়োকর্তা কিনা কানে শোনেন না।' আমাদের চাকরি বা জীবিকা এমনি করেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বিকৃত আর কিম্ভূত করে তুলছে। এটা কি স্বপ্নের জগৎ, চিতপাত শুয়ে-শুয়ে দেখা? এটা কি মনের জগৎ নিছকই, বাইরে যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই? এটা কি কিয়ের্কেগাড়ের 'জন্মই আসল পাপ' ধারণার পুনরাবৃত্তি, আমাদের প্রতিদিনকার জগতের সঙ্গে সব সাদৃশ্যরহিত? কাফকার লেখাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ভালটার বেনিয়ামিন দেখিয়েছেন, আপিশে, পরিবারের গণ্ডির ভেতর, জীবিকার প্রতিটি মোড়ে কাফকার লেখায়, একজন লোক কত, কতবার অন্য লোকের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে, একজনের সঙ্গে আরেকজনের যে কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা হয়, সেখানে হানা দেয় আর্থসামাজিক পরিস্থিতির যাবতীয় টানাপোড়েন। এটা তো কোনো অভাবিত, আপতিক, দৈবাৎ-ঘটা ব্যাপার নয় যে গ্রেগর সামসা জেগে উঠে নিজেকে পোকা বলে ভাবে পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই, পারিবারিক আবহাওয়াতেই, অন্য কোনো শস্তা, সাময়িক, ক্ষণকালীন হোটেলের ঘরে নয়—যেসব ঘরে তাকে প্রায়ই ভোররাতে জেগে উঠতে হত। চাপা আশা কি ছিল না যে বাবার তত্ত্বাবধান, মায়ের কোমল সেবা, বোনের শুশ্রূষা তাকে সারিয়ে তুলবে? কোনো শস্তা অচেনা হোটেলের ঘরে সে-সম্ভাবনাই তো কোথাও নেই—স্ফুট বা অস্ফুট এমন কোনো আশাই তো তাকে এমনভাবে আর কোথাও দোমড়াতে-মোচড়াতে পারত না। গ্লানি—সে তো মানুষেরই মনের ভাব, কিন্তু আত্মগ্লানি যতই প্রখর হোক, তার সামাজিক অবস্থান কেউ অস্বীকার করবে কী করে?

কিন্তু সব গ্লানি, সব লজ্জা, সব দুরূহ মর্মপীড়াই লোকে ভুলে যাবার—ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। "রূপান্তর" গল্পের শেষে ভুলেও কেউ একবারও গ্রেগরের নাম করে না; যাতে তার কথা কেউ মনে করিয়ে দিতে না পারে, সেজন্যে ঠিক করা হয় ঠিকে ঝিকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে হবে, এ-বাড়িটা বদলাতে হবে, গ্রেটাকে বিয়ে দিতে হবে—আর বসন্তও এই প্রথমবার মেঘলা দিনকে হটিয়ে দিয়ে চারদিক আলো করে তোলে। গ্রেগরের এই অমানুষিক মৃত্যু তা-ই কারু মনে রাখার দায় বা ইচ্ছে—কোনোটাই নেই; বরং উলটো ইচ্ছেটাই পরিবারকে চেতিয়ে দেয় বেশি করে।

অথচ সম্পর্কগুলো উড়িয়ে দিতে চাওয়ার ইচ্ছেটাও বিচ্ছিন্নতারই আরেকটি রূপ। নিজের বাড়িতেই অচেনা ছিল গ্রেগর সামসা, নিজের কাছেও অচেনাই ছিল, শেষ অব্দি; আর শেষটায় সে যে মৃত্যুটাকে বেছে নিলে সেও তো এইজন্যে যে সে বিচ্ছিন্নতার বলি, বিচ্ছিন্নতার শিকার; কতরকম বিষয় সে ভেবেছে গল্পের মধ্যে, সাত-পাঁচ, টাকা-কড়ি, আর্থিক নিরাপত্তা, চাকরি, ভাবী মুক্তির দিন, কিন্তু ককখনো ভাবে নি তার অসুখটার, তার বিচ্ছিন্নতার সত্যিকার চেহারাটা কী। 'কেল্লা' উপন্যাসে কা. প্রায় শ্‌ভেইকের মতোই মরীয়া, নাছোড়বান্দা চেষ্টা করে যাচ্ছে 'কেল্লা'র কর্তার কাছে পৌঁছুতে; 'মামলা' বা 'বিচার' উপন্যাসে য়োসেফ কা, হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানতে—শ্‌ভেইকের আনাবাসিনোর মতোই তার ঘুরপাক—কী তার পাপ; কিন্তু গ্রেগর সামসা একবারও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে নি ব্যাপারটা সত্যি কী (সেও তলিয়ে ভাখে নি, তার বাড়ির লোকও না—তার মৃত্যুর আগেও না, পরেও না)। সে একেবারেই পুঁজিবাদের কলে তৈরি অনেক মানুষের একজন—লেখাপড়া করে নি ঠিকমতো, সংস্কৃতি তার অনায়ত্ত (ফ্যাশান পত্রিকার পিন-আপ মহিলাই তার এবং তার বাবার শিল্পচিন্তার সারাৎসার), গুছিয়ে বলতে পারে না কোনো কথা। ওই অমানুষিক মৃত্যু ছাড়া আর কীই বা সে আশা করতে পারত?

১৮

এস-এ-এম-এস-এ / কে-এ-এফ-কে-এ।

একজন আসলে আরেকজনই, যেমন বলেছিলেন কাফকা, ক্রিপ্টোগ্রামের ধারণায় সায় দিয়ে। তবু তফাত আছে। সামসা ধরতে পারে নি বিচ্ছিন্নতাটা এল কোত্থেকে, কাফকা যে ধরতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর এই গল্প।

১৯

১৯২৪-এ যক্ষ্মায় কাফকার মৃত্যু হবার পরও কাফকার জীবন-চরিত শেষ হয় না। জন্মই যে অমানুষিক মৃত্যুর দোসর নয়, তার প্রমাণ দিতে ১৯৪২-এ আউসশভিৎস গ্যাসচেম্বারে মারা যান তাঁর বোন ওটলা, অন্য দুই বোনও জারমান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আগেই মারা গেছেন। ১৯৪৪-এ গ্রেটা ব্লখ খুন হন এক নাৎসি সৈন্যের হাতে। সেই বছরই মিলেনা মারা যান জারমান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

সামসা / কাফকা—একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে অন্য কীভাবে আবিষ্কার করতে পারত নিজেকে?

আলোচনা

রাজনীতি ও রাজীব গান্ধী

প্রধানমন্ত্রীকে রাজনীতির মধ্যে থাকতে হয়, আবার রাজনীতির বাইরেও থাকতে হয়। দলের নানা স্তরে যেসব রাজনীতিক শাসনব্যবস্থার নানা স্তরে দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাঁদের বেলাতেও অবশ্য ওই একই কথা খাটে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী সকলের ওপরে বলেই, সারা দেশের দায়িত্ব তাঁর ওপরে বলেই, এবং দলীয় রাজনীতিতেও তিনি সর্বপ্রধান বলেই, দলীয় গণতান্ত্রিক শাসনের এই দাবিটি তাঁকেই পূরণ করতে হয় সবচেয়ে স্পষ্ট এবং প্রকট ভাবে। যেমন তাঁর দলের, তেমনি তাঁর দেশেরও ভালোমন্দ যতখানি তাঁর ওপর নির্ভর করে, ততখানি আর কোনো একটি ব্যক্তির ওপর করে না।

দেশ আশা করে—দলের হয়েও দেশের চিন্তাকে তিনি সবার ওপরে রাখবেন; দল আশা করে—দেশশাসনের দায়িত্বভার তাঁকে তাঁর দলের কথা, তার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য, তার আদর্শ আর ঐতিহ্যের কথা ভুলিয়ে দেবে না। মনে হতে পারে, এই দ্বিবিধ দায়িত্বের মধ্যে, বিরোধ দূরে থাক, তেমন একটা পার্থক্যই বা কোথায়? দলের ঐতিহ্যের মধ্যে যদি দেশের মঙ্গলবিধানের চিন্তা নিহিত থেকে থাকে, দলের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য, দলের আদর্শ যদি তাকেই মূর্ত করে থাকে যাতে দেশের মঙ্গল, তাহলে দলের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এমন কী কর্তব্য থাকতে পারে, যা দেশের প্রতি কর্তব্যের পথ ছাড়া অন্য পথে টেনে নিয়ে যাবে? অধিকতর-সংখ্যক দেশবাসী যে দলের ঐতিহ্য, আদর্শ, লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করে, সে দলকে দেশশাসনের ভার দিয়েছে। সেই দল আবার সে ভার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাঁর ওপর, যিনি দলের মতে তা বহন করবার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত: এর পরে আর দেশের প্রত্যাশা, দলের প্রত্যাশা এবং প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্যের একসঙ্গে মিলে যেতে বাধা কোথায়?

দলের ভালো আর দেশের ভালো কি আলাদা? আমেরিকাতে একদা এই ধরনের অভিমত অনেকের মধ্যে

দেশে বিদেশে

প্রচলিত ছিল (এখনও সম্ভবত প্রচলিত আছে) যে, জেনারেল মোটরস-এর পক্ষে যা ভালো, তা আমেরিকার পক্ষেও ভালো। কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ঘুরিয়ে বললে সত্যটা আরও পরিস্ফুট হয়: আমেরিকার পক্ষে যা ভালো, তা জেনারেল মোটরস-এর পক্ষেও ভালো; এবং আমেরিকার পক্ষে যা ভালো নয়, আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক, স্বল্পমেয়াদি লাভের হিসেবটা যাই হোক, আখেরে তা জেনারেল মোটরস-এর পক্ষেও ভালো নয়। তেমনি, কোনো রাজনৈতিক দলেরও ভালোমন্দর যেমন একটা স্বল্প-মেয়াদি, তেমনি একটা দীর্ঘমেয়াদি হিসেবও আছে। সেই দীর্ঘমেয়াদি হিসেবটা দেশবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী হবে না, অন্তত ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করতে চাইবে না দেশের স্বার্থকে—এইটাই প্রত্যাশিত।

গণতন্ত্র ধরে নেয়—দেশের আপামর জনসাধারণ নিজেদের ভালোমন্দ নিজেরা বোঝে; এমনিতে সব সময়ে না বুঝলেও, বুঝিয়ে দিলে বোঝে, এবং কোনো এক পক্ষ জনসাধারণের সেই ভালোমন্দের বোধটাকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেও, তাদের ভুল বোঝাতে চাইলেও, অপর পক্ষ সে চেষ্টা প্রতিহত করবে, কিসে তাদের ভালো কিসে মন্দ, লোকের মনে সেই বোধটা জাগিয়ে রাখবে—গণতন্ত্র তাও ধরে নেয়।

কাজেই সদ্যোনির্বাচিত কোনো সংসদ-সদস্য, "আপনি কী করতে চান?" এই প্রশ্নের উত্তরে যখন বলেন, "আমি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করতে চাই" (কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে একজন ভূতপূর্ব সংসদ-সদস্য উক্তিটা হাস্যোদ্দীপক বলে উল্লেখ করেছেন), তখন শুধুমাত্র বাস্তব রাজনীতির দিক থেকেও কথাটার মধ্যে কিছু সারবস্তু থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। দলের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ, এবং তার সঙ্গে নিজের স্বার্থও অন্তত খানিক দূর পর্যন্ত এক পথে চলবে, যে-কোনো রাজনীতিকের পক্ষে এমন ধরনের চিন্তা অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীরাজীব গান্ধী সম্পর্কে গত কয়েক মাস ধরে যেসব আপত্তি, অনুযোগ আর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তার কিছু তাঁর দলের স্বার্থ-সংক্রান্ত, কিছু

দেশের স্বার্থ-সংক্রান্ত, এবং কিছু দেশ আর দল—এ দুয়েরই স্বার্থ-বিষয়ক।

তিনি দলের স্বার্থের ক্ষতি করেছেন. এ অনুযোগ দলের ভিতর থেকে উঠছে প্রায় প্রথম থেকেই, এবং কখনও-কখনও সে অনুযোগ সুস্পষ্ট অভিযোগের আকারও ধারণ করেছে। বলা হয়েছে, তিনি দলীয় ঐতিহ্যের মর্যাদা রাখেন নি ; বলা হয়েছে, তিনি আনুগত্যের মূল্য দেন নি ; বলা হয়েছে, তিনি এমন কতিপয় ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন যাঁরা দলের কেউ নন। তারপর এইসব অস্পষ্ট, অর্ধস্ফুট অনুযোগ একটা নির্দিষ্ট অভিযোগ হিসেবে সোচ্চার হয়ে ওঠে—কংগ্রেসের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মতাদর্শ তিনি পরিত্যাগ করেছেন।

নির্বাচনী সাফল্যের জোয়ারে এইসব অভিযোগ-আপত্তির ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তাতে যখন ভাঁটা পড়তে দেখা গেল, তখনই আবার নতুন করে দেশের জায়গায়-জায়গায় দলীয় বিক্ষোভ আর অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করল। ইতিমধ্যে পানজাব আর আসাম সমস্যার মীমাংসা, এবং তার জন্য কংগ্রেস (ই)-কে যে রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে দলের ভিতরে। বিশেষ করে পানজাব সম্বন্ধে প্রশ্নটা গুরুতর আকার নিল এই কারণে যে, দলের পক্ষে সেই ক্ষতিস্বীকার প্রত্যাশিত শান্তি আর স্থৈর্য সে রাজ্যে এনে দিতে পারে নি এখন পর্যন্ত। সবাই জানে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে "নাথিঙ সাকসীডস লাইক সাকসেস"। পানজাবে সেই সাফল্য এখন পর্যন্ত নাগালের মধ্যে এসেছে বলে মনে হয় না। তার ওপরে বেঙ্কটরামাইয়া কমিশনের সুপারিশ পানজাবের অশান্তির আগুনে আরও কতটা ঘি ঢালবে, সেখানকার অকালি সরকারকে আরও কতখানি বেকায়দায় ফেলবে, তার কোনো আন্দাজ এখনই করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে শ্রীরাজীব গান্ধীর সম্পর্কে প্রতিকূলতার মনোভাব আরও খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। শ্রীগান্ধী কি সে বিষয়ে অবহিত ? তিনি কি এত দিনে একথা সম্যক উপলব্ধি করেছেন যে, প্রশাসনিক নয়—রাজনৈতিক শক্তি নিয়েই এই প্রধানত রাজনৈতিক চ্যালেনজের সামনে তাঁর দাঁড়ানো দরকার ?

দলের নেতা হিসেবে দলের কার্যকর শক্তি বজায় রাখা শুধু নয়, তার বৃদ্ধি করাও তাঁর প্রধান কর্তব্য। নেতার প্রতি আনুগত্য শেষ পর্যন্ত সেই নেতার পক্ষেই বিড়ম্বনাস্বরূপ হয়ে পড়ে, যদি সেই আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত না হয় কর্মক্ষমতা। বলা বাহুল্য, রাজনীতিকের ক্ষমতা এবং কার্যকরতা বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর। তা যাঁর নেই, তাঁর আনুগত্যেরও বিশেষ কোনো মূল্য নেই। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করবার সময় ছিল না।

শ্রীগান্ধী দেশের অগ্রগতির স্বার্থে যদি সিদ্ধান্ত করে থাকেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে মতাদর্শের বাঁধন আরও খানিকটা আলগা করবার সময় এসেছে, যদি রাজনীতিতে যাঁরা অবসন্ন, নিঃশেষিত, তাঁদের জায়গায় যাঁরা নতুন, যাঁদের নতুন করে চিন্তা করবার, নতুন কর্মোদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে, তাঁদের এনে কাজে লাগাবার চেষ্টা আরম্ভ করে থাকেন, তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, এবং দলীয় নেতা হিসেবেও সে কাজ তাঁর পক্ষে না করা অনুচিত হত। যাঁরা এসব নিয়ে অভিযোগ তুলছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন, যে কংগ্রেসকে তিনি হাতে নিয়েছিলেন তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। শ্রীরাজীব গান্ধীর জায়গায় অন্য কেউ নেতা হলে সে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠত, এমন কল্পনা করা তাঁদের পক্ষেও কঠিন। ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যু দেশব্যাপী যে শোকের ঢেউ তুলে দিয়েছিল, তার থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস জনচিত্তে অনড় আসন অধিকার করে বসেছিল।

ঠিক তেমনি, শ্রী রাজীব গান্ধী সংসদীয় নির্বাচনে তাঁর সাফল্যের বহর দেখে যদি মনে করে থাকেন কংগ্রেস (ই) সারা দেশে অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক শক্তি, তাহলে সে ভুল এতদিনে অবশ্যই ভেঙে গিয়ে থাকবে। এতদিনে তিনিও নিশ্চয় উপলব্ধি করে থাকবেন, কংগ্রেসে (ই)-র দৈন্য এবং দুর্বলতার সীমা নেই, তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আত্মবিরোধ, পদে-পদে আত্মখণ্ডন। এখন তার শক্তির প্রধান উৎস বিরোধী দলসমূহের অক্ষমতা। যেখানেই তারা সে অক্ষমতা কাটিয়ে উঠছে, সেখানেই কংগ্রেস ধরাশায়ী হচ্ছে। যে বিপুল বহুব্যাপ্ত জনসমর্থন একদা কংগ্রেসের পিছনে ছিল, তা আজ বহুধাবিখণ্ড হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার যদি তাকে সংহত করে আনতে হয়, একমাত্র রাজনীতির পথেই তা সম্ভব হবে।

কংগ্রেস (ই) যদি রাজনৈতিকভাবে সক্ষম থাকত, তাহলে পানজাবের দিকে অসহায়ভাবে তাকে তাকিয়ে থাকতে হত না, অকালি দলের হাতে তাকে সঁপে দিতে হত না, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের এক অঙ্গরাজ্যের শাসনভার. এক ধর্মভিত্তিক দলের উপর অর্পণ করতে হত না। তালাক-দেওয়া মুসলিম মহিলার স্বার্থরক্ষার জন্যে এমন আইন পাশ করাতে হত না, যা আক্ষরিক অর্থে যদি নাও হয়, প্রকৃত অর্থে অবশ্যই সংবিধানবিরোধী।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য :

সংগ-প্রসংগ

সেমিনার : ভাষা সমাজ-সংস্কৃতি

কলকাতায় সম্প্রতি (২৯ মে থেকে ১ জুন) দু বাঙলার বিদ্বৎসমাজের ছোটোখাটো ঘরোয়া একটি সম্মেলন ঘটানো গেল। দুটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের দুটি দিক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ-সংস্কৃতিবেত্তাগণ খোলা মন নিয়ে কিছু আলোচনা করে গেলেন। গুরুসদয় রোডে বিড়লা বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রদর্শশালার নীচতলায় অনতিপ্রশস্ত কুলপিঘরে একটা গোলটেবিলকে ঘিরে মুখোমুখি জনা তিরিশেক বসেছিলেন, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন আরও পনেরো-বিশ জন সুহৃৎ, সমমনস্ক বান্ধব। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার হয় নি। সেমিনারের সবটুকুই বেশ নীচু তারে বাঁধা ছিল, যদিও তুমুল তর্কে গলা চড়েছিল বটে কারও-কারও ; তবু বলতেই হয়, চার দিন আলোচনার সবটুকুই গুরুত্বপূর্ণ কেজো কথায় ঠাসবুনট ছিল।

একটি ফোরামে দুই বাঙলাকে মননক্ষেত্রে মেলবার এই সুযোগটি "ক্রেসিডা" (Centre for Regional, Ecological and Science Studies in Development Alternatives) করে দিলেন। এরকম ঘটনা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এই প্রথম। "ক্রেসিডা" সকলেরই ধন্যবাদার্হ হলেন, বিশেষত বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা স্বাগতিক এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতা, অতিথিসেবা আর সৌজন্যে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞচিত্ত না হয়ে পারেন নি। "ক্রেসিডা"র উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা : আগত অতিথিবর্গকে রাজ্য-অতিথিশালায় স্থানদান, তাঁদের একতেয়ারে সর্বদা গাড়ি বরাদ্দ রাখা, নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলা আকাদেমিতে এক সন্ধ্যায় ঘরোয়া আলোচনায় আমন্ত্রণ, সদ্যঃপ্রকাশিত "প্রসঙ্গ বাংলাভাষা" নামে একটি (গ্রন্থের প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) একাধিক কপি উপহার প্রদান ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই শুভেচ্ছা আর সৌজন্যেও বাংলাদেশের বন্ধুরা সহজে বিস্মৃত হবেন না।

"ক্রেসিডা", বোধ করি সকলেই জানেন, বেশ কিছুকাল ধরে সমাজের নানান দিক নিয়ে জরিপ চালাচ্ছেন। তার ফলাফল কখনও-বা পুস্তিকাকারে, কখনও তাঁদের ইংরেজি গবেষণাপত্র "ট্রানজ্যাকশনস"-এ বা বাঙলা ত্রৈমাসিক "সংস্কৃতি ও সমাজ"-এ প্রকাশ করছেন। এসব রুটিন কাজ ছাড়াও তাঁরা আর একটি বড়ো দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন : "তারা সেনটার ফর স্টাডিজ ইন ইনডো-বাংলাদেশ রিলেশনস" চালু করেছেন। চারদিন ধরে যে সেমিনারটি হয়ে গেল তার উদ্যোক্তা ক্রেসিডার এই চর্চাকেন্দ্রটি। অনুষ্ঠানের বিভাজন হয়েছিল এভাবে : প্রথম দু-দিন (২৯, ৩০ মে) আলোচনা চলবে পশ্চিমবঙ্গে আর বাংলাদেশে বাঙলা ভাষা আর বাঙালি সমাজের অবস্থা নিয়ে ; বাকি দুদিন (৩১ মে, ১ জুন) হবে বাংলাদেশ আর পূর্ব-ভারতে গ্রামোন্নয়নের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা। প্রতি দিনই সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় সরেষেঠাসা কর্মসূচি (অবশ্য মধ্যাহ্নভোজ আর দু-বেলায় দুবার চা-বিরতি বাদ দিয়ে)। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও দু সন্ধ্যা (৩০-৩১ মে) ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নীহার রায় সেনটার ফর ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন (এটিও ক্রেসিডার আওতায় থেকে কাজ করছে)। প্রথম দিন নীহাররঞ্জন রায় স্মৃতি-বক্তৃতা দিয়েছিলেন ঢাকার "ছায়ানট" সংগীত-বিদ্যায়তনের অন্যতম স্থপতি, বাংলাদেশে "রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা ও

সম্মেলন"-এর অন্যতম আয়োজক, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক আর রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী ওয়াহিদুল হক, আর দ্বিতীয় দিনে অজিত বিশ্বাস স্মৃতি-বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. সমর সেন। বিষয় যথাক্রমে "বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা" এবং "এগ্রিকালচারাল ডেভলাপমেনট ইনটু বেঙ্গলস"।

পশ্চিমবঙ্গে আর বাংলাদেশে বাঙলা ভাষা আর বাঙালি সমাজ সম্পর্কে দু-দিনের আলোচনায় মোটামুটিভাবে স্পর্শ করা হয়েছিল ছটি প্রসঙ্গ: বাঙলা ভাষা ও বাঙালি মুসলমান; 'বাঙালি' আর 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের বৈরথে বাঙলা ভাষার অবস্থান; সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশে মাতৃভাষার অধিকার সংরক্ষণে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি; বাঙলা প্রচলন এবং টাইপরাইটারের সংস্কার; উভয় বঙ্গে বাঙলা ভাষার প্রমিত রূপ; সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা ভাষা প্রচলনের সমস্যা আর সমাধান অনুসন্ধান। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলী আনোয়ার, ওয়াহিদুল হক, জামিল চৌধুরী, মনসুর মুসা, হাসান আজিজুল হক, ড. হুমায়ুন আজাদ। এবং পশ্চিমবঙ্গের তরফে ছিলেন ড. অনিমেষকান্তি পাল, দেবেশ রায়, ড. পবিত্র সরকার, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, সমীর দাশগুপ্ত, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণ হিসেবে প্রবন্ধ পড়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, এবং নান্দীভাষণ দিয়েছিলেন ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত —সেটিও অনিন্দ্যসুন্দর একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ইতিপূর্বে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঈর্ষণীয় সাফল্য এবং অভূতপূর্ব সুনামের অধিকারী মুচকুন্দ দুবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত তো ছিলেনই, উপরন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চমৎকার এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ইংরেজিতে— মাঝে-মধ্যে অজস্র বাঙলা কাব্যপংক্তি দিয়ে। আর ক্রেসিডার পরিচালক ড. বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় তো স্বাগতিক পুরুষ হিসেবে সেমিনারের সাংগঠনিক ও নিয়ন্ত্রক শক্তি সর্বদাই ছিলেন।

সেমিনারের সাফল্য সম্বন্ধে অংশীদার পণ্ডিতজন সকলেই একমত। সমস্ত ব্যাপারেই দৃষ্টিকোণগত পার্থক্য তত বেশি ছিল না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু ব্যতিক্রমী পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তাঁদের পক্ষে সমর্থক পান নি। ছোটোখাটো মতদ্বৈত ছেড়ে দিলে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে মোটামুটি একই খাতে চিন্তাভাবনা করে থাকেন, অভিজ্ঞতার ধরন আলাদা হলেও বিশ্লেষণের সূত্রগুলো মোটামুটি একই থাকছে উভয় দিকেই। এবং সমস্ত ছাপিয়ে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল তা হল সহমর্মিতা আর সহযোগিতার আন্তর অনুভূতি, অপরিমেয় সদিচ্ছা, একে অন্যকে বুঝতে পারার আগ্রহ।

এ-জাতীয় ভাববিনিময় যত বাড়বে ততই মঙ্গল। বোঝাপড়ার লেনদেন হোক এবং তাতেই সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতির শ্রীবৃদ্ধি।

হায়াৎ মামুদ

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাদেরই মুখ চেয়ে রয়েছে

আসুন এবার আমরা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করি

এমন কোন প্রাকৃতিক প্রাচুর্য নেই যা আমরা ভোগ বা শোষণ করি নি। খনি খুঁড়েছি, বিরাট বন কেটেছি, আমাদের নদ-নদী সমুদ্রকে শিল্পোদ্যোগের উদ্বৃত্ত আবর্জনা দিয়ে ভরেছি। আমাদের শহরগুলোকে নোংরা আবর্জনার পাহাড় করেছি, নিঃশ্বাসের হাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছি। আমরা বন কেটে বসত গড়েছি। চাষের উর্বর জমিতে যথেচ্ছভাবে ইট-খোলা আর বালির খাদ করে অনেক উর্বর জমিকে বন্ধ্যা করেছি। কান ঝালাপালা করা অনর্থক শব্দে পরিবেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছি। অনেক বন্যপ্রাণীকে নিঃশেষ করতে বসেছি। আর হারাতে বসেছি আমাদের নাগরিক বোধবুদ্ধি। সভ্যতা ও কারিগরী-বিদ্যার অগ্রগতির নামে আমাদের পরিবেশকে আমরা ময়লা ও দূষিত ক'রে নষ্ট করে ফেলেছি।

কিন্তু আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কী ঐতিহ্য রেখে যাচ্ছি—একট নিঃস্ব রিক্ত পরিবেশ—আর বন্ধ্যা পৃথিবী?

মনে থাকে যেন, আমাদের পরিবেশ শুধু আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যই নয়—অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও। এখনি যদি আমরা তাকে দূষণমুক্ত না করি কাল কিন্তু খুব দেরী হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২৯৭৫/৮৬